



বাণায়ন

Batayan

ফিরে দেখা



Batayan just completed the journey of its first five years. The milestone was celebrated in Kolkata, India, on Sunday, January 6, 2019. It was a glorious event, called "Batayaner Panche Pa" which means "Batayan turned five years old". Literary enthusiasts from Kolkata, Sydney, Perth and USA gathered at the event. Some beautiful moments were created at the ceremony when lovers of art and literature from all over the world shared a single platform of creative expression. We fervently hope Batayan will continue to grow and embrace more creative artists in the upcoming days. When a sapling is sprouted from a tiny seed all the conditions of its nourishment has to be fulfilled for the sapling to become a tree. Thank you all for your support for Batayan and provide it with sunshine and warmth in the first five years of its life.

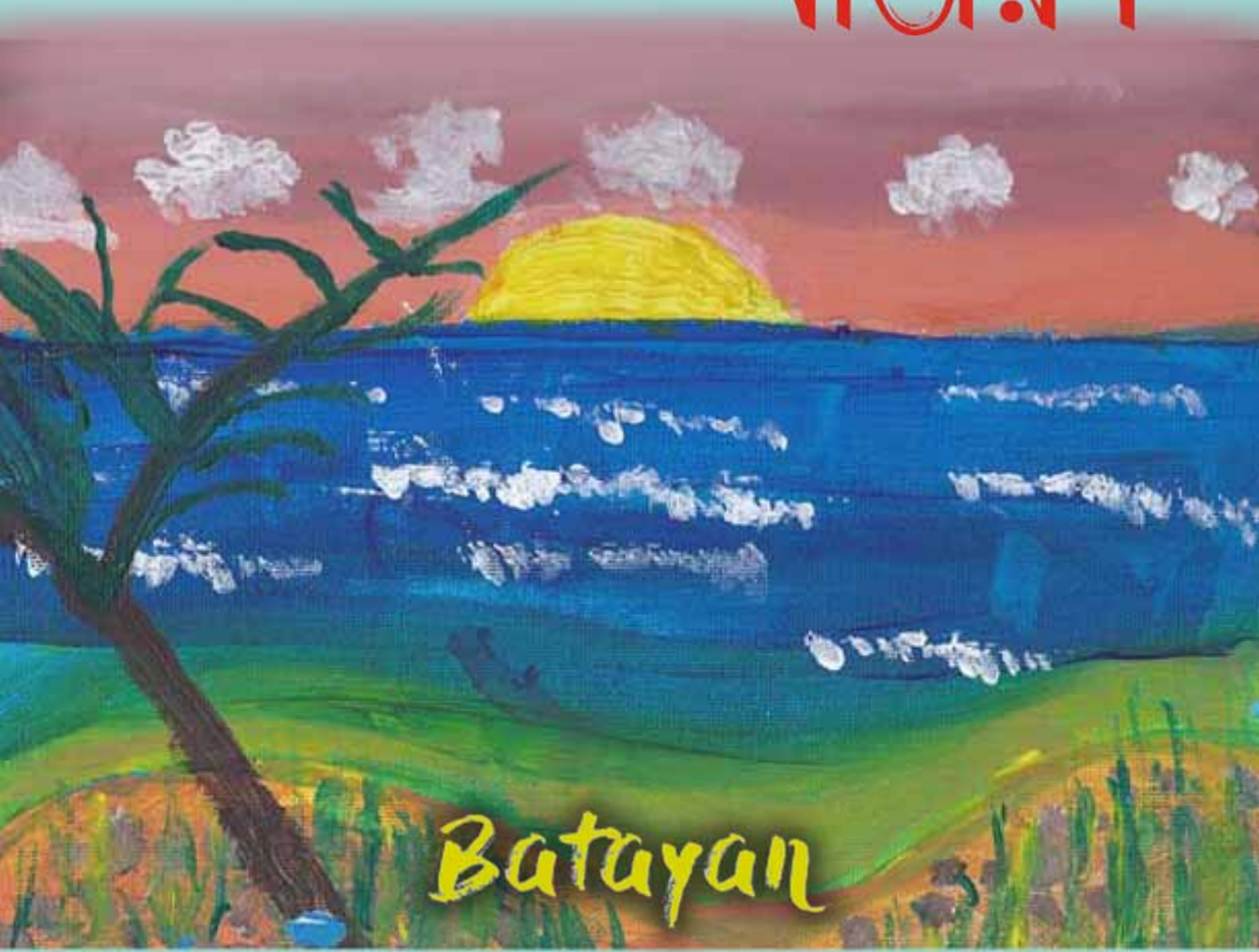
Ranjita

Perth perspective



Conceived by Anusri Banerjee as a bilingual international web magazine promoting literature and culture, *Batayan* is another pointer to a Kolkatan's labour of love. Banerjee is from Kolkata but has now settled in Perth, Australia, with her husband. *Batayan* has branched out from its roots in Perth, first to Chicago then to other cities across the USA, Australia and Europe. *Batayan* has also expanded its reach in the subcontinent to include Kolkata, other cities in India and Bangladesh. Following from its success as an online quarterly magazine it launched an annual printed edition. *Batayan* has got the inspiration and blessings of legendary poet Shankha Ghosh last year. *Batayan* has launched a new monthly on-line publication, *Kagojer Nauka* (The Paper Boat), which primarily features serialised novels, long stories and poems. *Kagojer Nauka* was launched featuring an exclusive new novel by the renowned UK-based author, Dr Nabakumar Basu. To commemorate its fifth year of existence a literary get-together was organised in Kolkata yesterday for building bonds between readers, contributors and enthusiasts of *Batayan* from across the globe. It was attended by *Batayan* contributors and men and women of letters.

বাণায়ন



চতুর্দশ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৯

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়



Issue Number 14 : January, 2019

Editors

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator

Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication

Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design & Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support

Susanta Nandi, India

Published By

BATAYAN INCORPORATED

Western Australia

Registered No. : A1022301D

E-mail: info@batayan.org

www.batayan.org

Production & Management

Anusri Banerjee

PHOTO CREDIT

Saumen Chattopadhyay, IL, USA

Front Cover



Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science, Native American flute and Indian classical music. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago with his wife, Ranjita, and his daughter, Suranjana is a Junior in UW Madison.

Tirthankar Banerjee
Perth, Australia

Back : Kolkata Book Fair, 2019



His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

Megan Charles, IL, USA

Back Inside Cover

Allen McNair, IL, USA

Title Page

I, **Allen McNair**, am a self-taught artist and poet inspired daily by the wonders of life around me, and by my present and past experiences. From individual poetic portrayals in my early years of writing, I have graduated to writing and illustrating my self-published epic saga, *I Dream of A'maresh*.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সঙ্গীত

শেষ হল ২০১৮। এখন আমরা পা দিয়েছি ২০১৯ এ। তা এই বছর শেষ-শুরুর খেলাটা নতুন কিছু নয়। লেগেই আছে। যে অবধি মানুষ সময়কে একক দিয়ে মাপতে শিখেছে সেই তখন থেকে। কিন্তু সময়ের কি শুরু বা শেষ সত্যি আছে? সময়ের গতি নিরবিচ্ছিন্ন। আমরা নিজেদের জীবনের নশ্বরতার কারণেই বোধহয় সময়কে দিন, মাস, সপ্তাহ, বছর ইত্যাদির গভীতে সীমাবদ্ধ করি। এতে করে চলমান জীবনপ্রবাহের ক্যানভাসে ঘটে চলা ঘটনাগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানবিন্দু দেওয়া যায়। এবারে এক ঝলক ফিরে দেখা যাক ফেলে আসা বছরটাকে। অন্যান্য বছরের মতো ২০১৮ ও পাওয়া-হারান, দুঃখ-আনন্দ, আশা-হতাশার সুতোয় বোনা এক নকশী কাঁথা। গায়ে টেনে নিলে যার ওম চাখতে বড় ভালো লাগে। তবে বছরটার শেষদিকে মানে হচ্ছিল ২০১৮ যেন শুধু কেড়ে নিতেই জানে। একে একে চলে গেলেন সাহিত্যিক-কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও দিব্যেন্দু পালিত, চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন, সংগীতশিল্পী শ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ নিঃসন্দেহে রিক্ত হল অনেকটা। কবি নীরেন্দ্রনাথ ছাড়া বাকীদের কর্মজীবন শেষ হয়েছিল বেশ কিছু বছর আগে। তাও যতদিন ব্যক্তি মানুষগুলি ছিলেন ছিল তাঁদের ব্যক্তিত্বের আলো আর উষ্ণতা। এখন আর সেটুকুও রইল না। তবে রয়ে গেলো তাঁদের সৃষ্টি পরবর্তী প্রজন্মের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে। সময়ের শাসন পার হয়ে তাঁরা বেঁচে থাকবেন নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে। “ডাকো ওকে ডাকো / ওই যে লোকটা পার হয়ে যায় কাঁসাই নদীর সাঁকো” – নীরেন্দ্রনাথের কবিতার মতো করে ডাকতে চাই প্রয়াত কবি পিনাকী ঠাকুরকে। কিন্তু এ ডাকে সাড়া দেবেন না তিনি জানি। মূলত প্রেমই ছিল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। উনিশ শতক বারে বারে এসেছে কবির লেখায়। সমসাময়িক কবি অংশুমান কর “দেশ” (১৭ই জানুয়ারী) পত্রিকায় পিনাকী ঠাকুরের স্মৃতিচারণার শিরোনামে যথার্থ বলেছেন “যে শরীর বেঁচে থাকলে জন্ম দিত মণিমুক্তোর” সত্যি বড় অকালে ঘুমিয়ে পড়ল সে শরীর। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার জগতে পিনাকী ঠাকুরের চলে যাওয়া তৈরী করলো বড় মাপের শূন্যস্থান।

এবারে আসি “বাতায়ন” এর “ফিরে দেখা”য়। এ বছরের গোড়াতেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে পত্রিকার বিশেষ সাহিত্য বাসর “বাতায়নের পাঁচে পা”, স্নেহাশীষ ভট্টাচার্যের লেখনীতে সে অনুষ্ঠানের মনোজ্ঞ বিবরণ আছে এই সংখ্যায়। কবি অংশুমান কর এর কবিতা বাতায়ন এর “ফিরে দেখা” সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। ফেলে আসা সময়কে নানাদিক থেকে ফিরে দেখেছেন দেবীপ্রিয়া রায়, মনীষা বোস, শাস্বতী নন্দী তাঁদের স্মৃতিচারণায় আর গল্পে। সৌমিত্র চক্রবর্তীর “গোলকিপারের বাবা” গল্পটি যেন দৃষ্টি না এড়ায়। তন্ময় চক্রবর্তী স্মৃতির ঝাঁপি খুলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কে। সুদীপ্ত চক্রবর্তীর বিদেশে বাংলা নাটক চর্চা বিষয়ক প্রবন্ধটি বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনাকারীদের নতুন করে ভাবাবে – সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। নানা স্বাদের কবিতায় নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর প্রয়াস করেছে এই সংখ্যায়। আশা করি বিষয়, ফর্ম ইত্যাদি নিয়ে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকবে আগামী দিনে। অনবদ্য সাহিত্যগুণসম্পন্ন আমাদের ইংরাজী বিভাগটিও পাশাপাশি আছে। আপনার মনের খাবারের সন্ধান পাবেন সেখানেও। তালিকা আর বাড়ানো না। এবারে সময় হয়েছে পাঠকদের ক্লিক করার বাতায়ন ওয়েবসাইট-এ, আমাদের চতুর্দশ সংখ্যাটি পড়ার জন্য। প্রচ্ছদের ছবিটি তোলা ফতেপুর সিক্রিতে – মুঘল আমলটা ফিরে দেখার ইচ্ছে করা খুব স্বাভাবিক।

আগামী দিন আপনাদের সকলের ভালো কাটুক। আনন্দে থাকবেন। সাহিত্য, শিল্প আর সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে থাকবেন – বাতায়ন পত্রিকাটিকে ভালোবাসবেন যেমন করে গত পাঁচ বছর ভালোবেসে এসেছেন – অনুরোধ রইলো। ইংরাজী ২০১৯ এর আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা সহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

শিকাগো, ইলিনয়

বাতায়নের “৫এ পা”

কলমে – সঞ্চালক স্নেহাশিস ভট্টাচার্য্য

“আরে সমানে দাঁড়িয়ে কেন ? একটু বসতে হবে তো !”
অনেকক্ষণ ধরে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কবি তন্ময় চক্রবর্তীর
এই উক্তি। কি করে আর বোঝাই যে, ওনার তো ‘দাঁড়াবার জায়গা’
আছে তাই উনি বসে আছেন।

হ্যাঁ গত ৬ তারিখ বাতায়নের পাঁচ বছরের প্রাপ্তি পালন সন্ধ্যায়
কবি তন্ময় চক্রবর্তী ছিলেন, আর বেশ স্ব-মহিমায় ছিলেন।

একটা জিনিস ভাবলে অবাক লাগে, ভাল লাগে, শ্রদ্ধা বাড়ে,
বিপরীত গোলাধে একদল মানুষ, একদল জন্মসূত্রে ভারতীয়,
একদল মনে, প্রাণে, জিনে বাঙালী সমগ্র বিশ্বের সামনে বাংলাকে
সাজিয়ে তোলার এক নিরলস সাধনায় ব্রতী। জেনেটিব্লে ডক্টরেট
অনুশ্রী ব্যানার্জী এর মূল কাভারী। আর তার এই প্রচেষ্টায় সামিল
তার গোটা পরিবার। সেদিনও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বাতায়নের
জন্ম অস্ট্রেলিয়াতে হলেও কর্ম যে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে তার
প্রত্যয়ী আভাস দিলেন। সকলকে হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ
করলেন তার খোলা মন দিয়ে।

শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক বাড়ী,
৭৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড, অধুনা ‘ভবনস’ নামের শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামটিকেই ভাবনায় আনা হয়েছিল,
বাতায়নের বন্ধুদের সাথে আলাপচারিতার স্থান হিসেবে। এই
ব্যাপারে কিন্তু মূল কারিগর স্বনামধন্য শ্রী বিশ্বজিৎ মতিলাল মহাশয়।
তার পরিচয়ও শিগগিরই দিচ্ছি।

বাতায়ন নামেই পরিচয়, এক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, যা ছড়িয়ে
পড়ে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে। আবার বছরে একটা
সংকলনও প্রকাশিত হয় ছাপার অক্ষরে, যা হাতে রেখে, নেড়েচেড়ে
গল্প নিয়ে অনুভব করা যায়। বাংলা আর ইংরেজী দুই ভাষাতেই গল্প,
কবিতা, বড় গল্প, প্রবন্ধ, সাহিত্যের উৎকর্ষতা নিয়ে হাজির থাকে।
“কাগজের নৌকো” নামের পত্রিকাটিও বাতায়নের মানসপুত্র,
মূলতঃ ধারাবাহিক উপন্যাস, বড় গল্প নিয়ে এই পত্রিকাটিও এগিয়ে
চলেছে বেশ মসৃণ গতিতেই।

সব জানলা দরজা হাট করে খুলে দিয়ে নতুন প্রতিভা অন্বেষণই
মূল লক্ষ্য। লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়া সকলের মনে বাংলা ভাষাসাহিত্যের
হাত ধরে। সফলতাও ক্রমশঃ ধরা দিচ্ছে, পাঠকদের স্বতঃস্ফূর্ত



ভুবনজোড়া স্বজন সুজন
বাতায়নের ধার ঘেঁষে,
চা'য়ের কাপে তুফান উঠুক
৫এ পা'য়ের মজলিসে।

আগামী ৬ই জানুয়ারী, ২০১৯ (রবিবার)
“বাতায়ন” পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ পদার্পণ
উপলক্ষে ভারতীয় ও প্রবাসী লেখক,
পাঠক ও প্রিয়জনদের নিয়ে এক
জমজমাট আড্ডার আসর।
স্থান : “ভবন’স আশুতোষ কলেজ অফ
কমিউনিকেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট”,
৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জী রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০২৫।

“৫এ পা”

এই আনন্দযজ্ঞে আপনাদের সাদর
আমন্ত্রণ। আপনার উপস্থিতিই হবে
আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা।

অনুশ্রী ব্যানার্জী
বাতায়ন

যোগাযোগ :

অনুশ্রী - ৮৪২০৩ ৩৯৬৮৬
+৯১ ২৩৯৬ ৬৭১৭
মানস - ৯০০২০ ৮৫৫৬৮
স্নেহাশিস - ৮৭৭৭৫ ০৩০৬৭

সৌজন্যে -



পত্র ভারতী



অতিথি সমাবেশ শুরু বিকাল ৫' টা।

উৎসাহে। সেদিনের বাতায়নি সন্ধ্যার শুরুতে এই মূল ধারাটাই ধরিয়ে দিলেন ত্রিদিব আর চুমকি চ্যাটার্জী। সাহিত্য জগতের অতি পরিচিত দুটি নাম। কিশোর ভারতী নামটার সাথে আজও বাঙালী মাদ্রেই পরিচিত। কিশোর মননকে দীর্ঘ সময় ধরে সিঁধিত করার দায়িত্ব নিয়েছে পত্রভারতী। আর এনারা দুজন এই নৌকোর কাণ্ডারি। শুধু প্রকাশক নয় লেখক লেখিকা আর আয়োজক হিসেবেও এক ডাকে চেনা নাম। পাবলিশার্স এন্ড গিল্ড এর সাম্মানিক সম্পাদক ত্রিদিববাবু বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের স্মৃতিচারণ আর ভবিষ্যত রূপরেখায় সর্বতোভাবে বাতায়নের পাশে থাকার ভাবনাও যে চলছে তার ইঙ্গিত দেন। স্বল্প অথচ খুব মনোগ্রাহী তার বক্তব্য। তাদের কথার খেই ধরেই যেন মাইক ধরলেন বিশ্বজিতবাবু। যিনি ত্রিদিববাবুর ভাষায় সাংবাদিককুলের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তি, গণ জ্ঞাপন যার নেশা আর পেশা দুই। স্বপন মল্লিক, প্রবীণ সাংবাদিক, চলচ্চিত্র বিষয়ে লেখালেখি করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন এ হেন উদ্যোগের। মুখরা তো শেষ হলো। এরপরেই সংগীতের মতোই গুনগুন করে উঠলো একে একে কলকাতা আর প্রবাসী অর্থাৎ সিডনি, মেলবোর্ন বা পার্থ এর সেই সকল নাগরিকবৃন্দের কণ্ঠ। ডক্টর মৌসুমী ব্যানার্জী, ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী দত্ত, পল্লব বরণ পাল, কৌশিক সেনগুপ্ত, জয়শ্রী দাশগুপ্ত বিশ্বাসরা। আড্ডার আসর ক্রমশঃ শীতের রাতের নমনীয় উষ্ণতা নিয়ে এগিয়ে চললো। আর তাতে নতুন মাত্রা আনলেন সৌমিত্র চক্রবর্তী। তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় কবিতা আর ছড়ার মাধ্যমে এক অনবদ্য কাব্যরস সৃষ্টি করে সভায় এনে দিলেন এক অনাবিল হাসি আর ভালোলাগার পরিবেশ। পল্লবদার পর সেই ধারায় সংযোজিত হলেন কবি তন্ময় চক্রবর্তীও। মমতা দাসের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রতিটি আলোচনার একটি বিশেষ মাত্রা দেয়। পরিযায়ী পাখির মত শিকাগো আর কলকাতার মধ্যে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। পড়া, লেখা ও অনেকের সাথে পরিচিতি তার। তাই আড্ডার আসর তিনি মাতিয়ে রেখেছিলেন। এরপর সকলেই বিস্ময় চেপে গুনতে থাকলো মিলনবাবুর মুখে সেই ঘটনা সমূহ, যেভাবে তিনি নিজেকে নিবেদিত করেছেন বাঙালী তথা বাংলা ভাষাকে স্থান দিতে বিদেশে। স্বল্প অথচ স্বতঃস্ফূর্ত কথায় মন কেড়ে নিলেন বিখ্যাত উপন্যাস ‘বসন্ত অফুরানে’র লেখিকা শাস্বতী নন্দী দিদি। আড্ডায় হাজির, কবিতাকে মন থেকে ভালোবাসা উপাসনা সরকার। তার স্নিগ্ধ উপস্থিতি আর অসাধারণ উপস্থাপনা সমস্ত অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে হাজির করে। বার্তা বিনিময় তখন প্রায় আত্মীয়তার উষ্ণতায়, বুঝি বা আঁচ পোহাতেই মঞ্চে এলেন কাগজের নৌকোর সম্পাদক মানস ঘোষ। মাইক্রোফোন সরিয়ে রেখে অমায়িক মানসবাবু, সহজ সাবলীল ভঙ্গিমায় সবাইকে আন্তরিক আবেদন জানালেন বাতায়নের সঙ্গে থাকার জন্য। এক মনোরম ভঙ্গিমায় নিজের প্রাপ্তি সকলের সামনে হাজির করলেন ‘লাদাখ-ভ্রমণ’ খ্যাত মৌসুমীদি। সমস্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিল প্রচ্ছদ আঁকায় পারদর্শী সদ্যযুবাবু বেঞ্জামিন ঘোষ। তাদের হাসি নিয়ে সবাইকে ফ্রেমবন্দি করে রাখলেন তীর্থঙ্করবাবু আর বালার্ক ব্যানার্জী।

ততক্ষণে তিনটি ঘন্টা পেরিয়ে গেছে ঘড়ির কাঁটা। ভাঙা হাটে তখনো চাঁদের আলো অল্প। বাড়ী ফেরার পালা, জানলা খোলা রইলো। আর আমি ঐ আড্ডার শেষ পালক হয়ে তখনো দাঁড়িয়ে, বসা হয় নি।...

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য ভারী সুন্দর করে “৫এপা” অনুষ্ঠানের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হল। কি একটা যেন নেই! পরে বুঝলাম, এই অনুষ্ঠানের মূল আবহরচনা, সমন্বয়, ও অনবদ্য সঞ্চালনার কথাটাই তো বাদ পড়ে গেছে। নিজের পারফরমেন্সের কথা নিজে আর কি করে লেখেন!

সেদিনের অনুষ্ঠান যে মুসীমানার সঙ্গে স্নেহাশিস সঞ্চালনা করেছিলেন তা আমাদের মনে থাকবে। প্রত্যেককে ডাকার আগে, তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর্বটি ছিল ভারী চিত্তাকর্ষক। অনেকেরই পরিচয় দিলেন তাঁর কবিতার দুচার লাইন উদ্ধৃত করে। মাঝের সময়টুকু কবিতায়, মজার মজার কথায় ভরে রেখেছিলেন স্নেহাশিস। ঐ স্বল্প সময় পরিসরে সবাইকে যথোচিত সম্মান দিয়ে অধিকাংশ অতিথিকে বলার সুযোগ করে দেওয়া খুব সহজ কাজ ছিলনা। সেটা সফলভাবে করা আর বাতায়নের পারিবারিক ঘরোয়া আড্ডার আবহ শেষপর্যন্ত ধরে রাখার জন্য স্নেহাশিসকে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

— মানস ঘোষ

সূচীপত্র

Bangla Section

— কবিতা —			
অংশুমান কর	8	শাশ্বতী নন্দী	24
আদমসুমারি		নদীর বাঁক যেন ডাকে ফিরে ফিরে	
গৌতম দত্ত	9	দেবীপ্রিয়া রায়	27
রঙ মাখা দেখেছি তোমাকে		নিয়ম কানুনের গোলকধাঁধায়	
শ্রীজাতা গুপ্ত	10	মনীষা বসু	31
অন্য বর্ষা		বিষ্ণুপ্রিয়াদি	
দেবশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়	11	— গল্প —	
কাটা ঘুড়ি		পিনাকী মন্ডল	35
রবিরশ্মি ঘোষ	13	কালো ছত্রাক	
নির্বাসিতা		উপাসনা নন্দী	43
স্নেহাশিস ভট্টাচার্য	15	ব্রিজ	
উপহার		দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী	48
উদালক ভরদ্বাজ	16	সোনার চুল	
আমৃত্যু		রজত ভট্টাচার্য	53
অতীশ ব্যানার্জী	17	সংসপ্তক	
অর্থহীনস্মন্যতা		সৌমিত্র চক্রবর্তী	54
আনন্দ সেন	18	গোলকিপারের বাবা	
পাগলা ঘোড়া		রুমবুম ভট্টাচার্য	58
মানস ঘোষ	19	রতনের ফেরা	
তিন অনু কবিতা		— অনুবাদ —	
— ফিরে দেখা —		পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ — সুজয় দত্ত)	38
তনুয় চক্রবর্তী	20	ঝড়	
“অমলকান্তি রোদুর হতে চেয়েছিল”		— প্রবন্ধ —	
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়	22	সুদীপ্ত ভৌমিক	61
ভোর — জানালার বাইরে		আমেরিকায় বাংলা নাটকের নব জাগরণ	
		সেতুবন্ধন, জানুয়ারী ২০১৯	64

English Section

— Poem —			
Susan Koenig	66	Mekhala Banerjee	74
Amber		Just a Guy	
M.C. Rydel	67	Sreya Sarkar	78
Blurred Edges		Demonizing Intellectualism in India is Like Punishing the Youth for Being Curious	
Kathy Powers	68	Souvik Dutta	83
How Peace Works		Shuka and Janaka	
— Story —		— Film Review —	
Maureen Peifer	69	Jill Charles	71
Friday Afternoon		Mary, Queen of Scots	
Susim Munshi	72		
Essays from The Education of a Bengali Gentleman — A Sister's Pride			



অংশুমান কর

আদমসুমারি

মাটিতে উবু হয়ে বসে
 লম্বা লোহার পাইপে মুখ দিয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে,
 কয়লা ভাঙছে শক্ত পাথরে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে,
 গুল দিচ্ছে,
 চল্লিশ ফুট গভীর কুয়ো থেকে জল তুলছে
 তারপর কাঁখে করে বয়ে আনছে ঘরে।
 স্বপ্নের মধ্যে মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে আসে
 ছোটবেলায় দেখা এসব দৃশ্য।
 হিসেব কষে বুঝতে পারি
 তখন আমার মায়ের বয়স ছিল চব্বিশ বা পঁচিশ
 রোগা চেহায়ায় ছিল হিজল গাছের শ্রী
 আর বড় বড় দুই চোখে জেদ।
 বুঝতে পারি, বাংলায় বাঘ কমে যাচ্ছে বলে
 যে বিশেষজ্ঞরা হা হতাশ করছেন
 হিসেবে ভুল হচ্ছে তাঁদের।
 শুধু দময়ন্তী নন
 ছেলের হাত শক্ত মুঠিতে ধরে যাঁরা পেরিয়ে যাচ্ছেন রাস্তা
 গ্রামে মাটির দাওয়ায় আর কলকাতায় শক্ত ফুটপাথে উবু হয়ে বসে
 লোহার পাইপে মুখ দিয়ে
 যাঁরা ফুঁ দিচ্ছেন উনুনে
 তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন বাঘিনী।



অংশুমান কর এই সময়ের একজন খ্যাতনামা কবি এবং সাহিত্যিক। তিনি পেশায় অধ্যাপক। বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলা কবিতার জগতে, তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ইতিমধ্যেই তিনি কৃষ্ণিবাস (২০০৭), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি (২০০৯), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (২০১২) ইত্যাদি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন। মূলত কবি হলেও তাঁর বেশ কিছু গদ্যলেখও পাঠক সমাজে সমাদৃত।

গৌতম দত্ত

রঙ মাখা দেখেছি তোমাকে

ভুল হয়ে যায় বার বার
 আল্লাহর ফাঁদে না বুঝেই রাখি পা
 সবুজে নিঝুম হয়ে ছোট্ট বোকা মন
 শব্দের, আলোর থেকে দ্রুতগামী বেগে
 হরিণ শাবক যেন বাঘের তাড়ায়
 বিশাল চোখের নীচে অশ্রুবিন্দু নিয়ে
 অন্যের খাবার হয়ে সে নিয়েছে মাটি
 সে আমার যেন প্রেম আমার চিৎকার
 বোঝাতে পারছি না সেই নিঃশব্দ যন্ত্রণা
 তুমি কেন প্রতিবার একই ভুল করো ?
 ভালবাসা জালে পড়ে নিজেকে জড়াও
 আল্লাহর ফাঁদে পা দাও আবার
 জেনে শুনে ভুল করো ম্যাজিক খেলায়
 যবে থেকে রঙ মাখা দেখেছি তোমাকে
 জেনেছি বসন্ত আসছে চাই বা না চাই
 ভুল করে ভালোবাসি ঈশ্বর উপেক্ষায় ।



গৌতম দত্ত প্রায় চল্লিশ বছর আমেরিকাবাসী । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । নাট্যকার ও কবি । ১৯৯০ দশকে লিখেছেন প্রমা পত্রিকায় । তারপর ধারাবাহিক ভাবে লিখেছেন নবপর্যায় কৃতিবাসে । লিখেছেন দেশ, সানন্দা সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় । কাব্যগ্রন্থ – গৃহ যুদ্ধের দলিল (আনন্দ), বরফে হলুদ ফুল (প্রতিভাস), যোদ্ধা ঘুমিয়ে আছে (প্রমা), মুখোমুখি (প্যাপিরাস) । একশো বছরের আফ্রিকান আমেরিকান কবিদের কবিতা সংকলন “আমি আমার মৃত্যুর পর স্বাধীনতা চাই না” (আনন্দ) সুনীল গঙ্গাপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনা । উড়ালপুল ওয়েবজিনের সম্পাদক ।

শ্রীজাতা গুপ্ত

অন্য বর্ষা

তোমার হাতে
হাত ছোঁয়ালে
বৃষ্টি তুমুল
নখের নীচে
র্যাপুঞ্জেলের
ভুল শহরে
দুই বিনুনি
কম পড়েছে
তোমার ঠোঁটে
চোখ ভাসালে
মেঘের কোলে
আম্নগোপন
ইচ্ছে খুবই
এসব লিখি
প্রেম জানাবো
নতুন করে
রঙিন জলে
শুকনো পাতা
ঝড় নামাবে
অবাধ্য মন
সেরুলিয়ান
নীল পোশাকে
আকাশ জুড়ে
রাজপুত্রর
নাম খুঁজেছি
অভিসারের
শীতল নদী

পাঠ শিখেছি
অস্থিরতায়
ভুল বুঝেছি
নিত্যনতুন
কৃষ্ণচূড়ার
নাম রেখেছি
শুদ্ধ রেখাব
তোমার হাতে
মুখ লুকিয়ে
ইচ্ছে ভীষণ
অলক্ষ্যে ফের
বর্ষা আসুক
অন্যরকম



শ্রীজাতা গুপ্ত, জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা কলকাতায়। চাকরিসূত্রে, এই মুহূর্তে এডিনবার্গ-বাসী। কম্প্যারেটেড সাইকোলজি বিষয়ে গবেষণারত, শ্রীজাতার কাজ মূলত মানুষের মন ও ভাষার বিবর্তন নিয়ে।

শখ: দেশ দেখা, ছবি তোলা, রান্না-বান্না; বেশি কথা বলতে পারে না, তাই কম কথা লিখে রাখা।

দেবালীষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাটা ঘুড়ি

‘কই তোমাদের হোলো ?’
সেই সকাল থেকে বসে আছি স্নান করে,
পেতে চুল আঁছড়ে,
পুজোয় পাওয়া পাঞ্জাবি, পাজামা পরে ।
পন্ডসটা গালে ঘষতে ঘষতে আবার চিৎকার করলাম,
‘কবে তোমরা পুজো করবে আমায় ?
নটা বেজে গেলো আর কতক্ষণ ?’

পন্ডস এর কৌটোর তলানিতে যে সাদা প্রলেপ
সেটা আঙ্গুল বেকিয়ে নিতে গিয়ে কেটে গেছে রাংতায়
কাউকে বলিনি . . . অন্যদিন হলে
এতক্ষণে তিনটে ব্যাভেজ পড়ে যেত
দিদি বললো ‘দাঁড়া লুচি গুলো ভেজে নিই . . .
আর একটু . . . মা, চন্দনটা ঘষে দেবে ?’
মায়ের ঠাকুর ঘরে যেতে যেতে আদুরে শাসন
‘চুল মুছেছিস ভালো করে ?
যা ঘন চুল . . . এই আবার ঠান্ডা লাগবে’
‘মা খুব খিদে পেয়েছে, দিদিকে বলো না . . .
আর কখন পুজো করবে আমায়,
নটা যে বেজে গেলো ?’
মা বললো ‘যা, বিরক্ত করিসনা ..
বাগান থেকে দুটো দুবো ঘাস নিয়ে যায়’

বাগানে তখন দূর্বা ঘাসের গায়ে
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণাভ হেমন্তের রোদের টুকরো গুলো
টলটল করছে,
এক লালপিঁপড়ের দল বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে
ওদের শিকড়ে শিকড়ে হারিয়ে যাচ্ছে
পরশু রাতের পোড়ানো দোদোমা পটকার
ফাঁপা শরীরগুলো

বাগানে ইতস্তত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে,
বেঁচে থাকা বারুদের ছিটেফোঁটা
সারারাত শিশিরের স্নেহে
এখন নরম, তুলতুলে, আঠালে
বাদলা পোকাকার পাখাগুলো তখনও ঝাঁট দেয়নি কেউ,
হাঁটতে গেলে পায়ের তলায় আটকে যায়
ওদের একরাতের উড়তে চাওয়ার দাম

হঠাৎ একমুঠো পশ্চিমের হাওয়া
গুলতির থেকে ছোট্ট মার্বেলের মতো
আমার বসে থাকা চুল এলোমেলো করে দিল
ফিরে তাকাতেই দেখি
একটা কাটা ঘুড়ি, পেয়ারা গাছের
পুবডাল থেকে ফত ফত করছে
আমি কাছে গিয়ে বললাম
‘এই তুমি কি পথ হারিয়েছো ? আটকে গেছো ?
তোমাকে গাছ থেকে খুলে দেব ?
উত্তর এলো ‘কে বললে ?
মাঞ্জা সুতো-কাটা অনেক খেলেছি,
আমি আজ মুক্ত, একটু জিরিয়ে নিচ্ছি শুধু . . .
ওই যে পশ্চিমের অলকাস্তর মেঘ দেখছো,
ঝড় উঠছে একটু পরেই . . .
আমিও তো উড়ে যাবো দেশ দেশান্তরে ।’
আমি হঠাৎ বলে ফেললাম ‘দেখাবে আমাকে পালপাড়া,
চক্কোভি পাড়ার কালীপুজো দুটো ?
কদিন থাকবে জানিনা . . .
খুব দেখার ইচ্ছে, আর বোধহয় দেখা হবে না’
ঘুড়ি হেসে বললো ‘আমার সাথে এলে যা দেখবে
তা তোমার ভোরের স্বপ্নে এখনো আসেনি,
উড়তে উড়তে

ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাব গিরিশিখর,
গহীন অরণ্য উপত্যকার
গাভাঙা জলরাশিতে বয়ে যেতে যেতে
যদি ক্লান্তি আসে
উঠে বসবো সার্কুমুলাস মেঘবিছানায়,
শুয়ে শুয়ে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জন্ম লিখবো

অনেক দিন কেটে গেছে..
কাটাঘুড়ির সাথে
হাজার অচেনার বিস্ময়ের বিস্তারে
নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে
পালপাড়ার কালী পুজোটা আর দেখা হয়নি
চন্দনের ফোঁটার চুইয়ে চুইয়ে
রংখসা চৌকাঠের ফাটলে মিশতে মিশতে
প্রতীক্ষার স্তর গুনেছে,
দিদির স্নেহালু হাত থেকে ধান, দুৰ্বেদ্যাস
আমার কপাল ছুঁয়ে পড়েনি আর

লুচি মিষ্টি দিয়ে সাজানো
কাঁসার থালার কারুকার্যে

তবু কখনো গ্রীষ্মের দাবদাহে
যখন অনুভব করি কপালে ঠান্ডা চন্দনের
ফোঁটাছোঁয়া দিদির কড়িআঙুল,
অথবা প্রচণ্ড খিদের মুখে পাই
নতুন পাঞ্জাবির মাড়ের গন্ধ মাখা
দশ টাকার কড়কড়ে নোট,
আমি কাটাঘুড়িকে বলি,
'আমাকে ঘরে ফিরিয়ে দেবে?'
ও বলে .. 'আজকাল ঝড়ের বড় আকাল,
দেখেছো একটা যুৎসই ঝড়?
যা পৌঁছে দিতে পারে হারিয়ে যাওয়া সব ঠিকানায়'
আমি চুপ হয়ে যাই, আর
যমের দুয়ারের পড়ে থাকা কাঁটা গুলো
একটা একটা করে গুনি ।



Debasish Banerjee — Debasish lives in Michigan, USA. His writing has been published in different little magazines.

রবিরশ্মি ঘোষ

নির্বাসিতা

সন্ধ্যা ঘনায় আসে, সাজে অমরাবতী
অপরূপ মোহিনী, আঁধারে করে নিতে
আলিঙ্গন। সৃষ্টির আদি হতে নিরত
সে নিরন্তর, বিরামহীন বিলাসের
পসরা সাজায় প্রতি দিন। দিবসের
শেষে, নন্দন কাননে দাঁড়িয়ে একেলা
দেখিতেছিল প্রাসাদ পানে অপলকে,
উর্বশী। পদশব্দ শুনি বক্র হাসির
দামিনী রেখা চমকিল যেন অধর
পরে। কহিলা, “হে দেবর্ষি, কিবা সংবাদ
লয়ে আসিছ হেথা গোধুলির বেলায়,
নিভৃত কানন মাঝারে?” অন্তরাগের
আলোক ছটায় হেরি অপরূপ রূপ
কহিলা নারদ, “নহি সংবাদবাহক,
ভক্ত আমি শুধু, ভজি নারায়ণ।
নহি সংবাদ কিছু, কুশল জানিবারে
করি আশ্রয়।” বিষন্ন হাসিয়া কহিলা
উর্বশী, “হে দেবর্ষি, কুশল নহি কিছু
জানেহে সকলে, স্বর্গ হতে বিতাড়িতা
আমি, স্বর্গলোকের শেষ সন্ধ্যার নিতেছি
আস্বাদন।” “আছি অবগত আমি”, ধীর
কণ্ঠে কহিলা নারদ। “তবে কি আসিছ
করিতে কৌতুক? শোভা নহি দেয় এই
আচরণ তোমারে হে দেবর্ষি।” হাসিয়া
কহিলা নারদ, “উপহাস অভিপ্রায়
নহে মোর। আসিয়াছি বিদায়ের লগ্নে
দু দণ্ড করিতে বার্তালাপ। হইবে কি
সে সৌভাগ্য মোর হে সুরলোক সুন্দরী?”

গোধুলি বেলার কুহেলী জালে ছড়ায়
কুহক যেন। মোহিনী হাসির আড়ালে
লুকায়ে গরল জ্বালা, কহিলা উর্বশী,
“ভাবিলাম কাটাইব দুই দণ্ড একা,
তবে দেবর্ষি সঙ্গ কাম্য সদাই। বন্ধু
যদি কেহ থাকে এই স্বর্গলোকে আজি
তবে সে শুধু তুমি, হে দেবর্ষি নারদ।”
“মনোব্যথা তব সকলি বুঝিতে পারি,
তবু কর উন্মোচন তব মনোভূমি,
শুনিতে আশ্রয়ী আমি সদাই।”, কহিলা
নারদ। “বহুকাল হতে নিরবধি যে
করেছিনু সাধনা, হইতে সর্বশ্রেষ্ঠা
অঙ্গরা কূলে, তারই ফলে লভেছিনু
সে আসন, যা আজি নিজ কর্মদোষে
হারালেম সহজে অতি। বিধাতা মোরে
কুম্ভে কি কুমতি দিলা, হারালেম তা,
যার লাগি করেছিনু সাধনা কঠিন।”
দিবসের শেষ আলোকছটা মিলায়
দিগন্তরেখা পরে। তারই দিকে চাহি
কহিলা নারদ, “যা তুমি লভিয়াছিলে
সাধনার বলে সে সকলি মায়া, মিথ্যা
স্বপন সম, সত্য কেবলি তব সত্ত্ব।
অঙ্গরা মাত্র নহে যে পরিচয় তব,
নারী তুমি, সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয়
সে যে, সেই পরিচয়ে দিয়াছ সম্মান,
পরিত্যাগ প্রেমের জয়তিলক। এ নহে
নির্বাসন, জয়গাথা যে নারীসত্ত্বার
তব, বিজয়িনী তুমি আজি, হে উর্বশী।”

“কিরূপ বিজয় ইহা, নাহি জানি আমি ।
নিদারুণ দণ্ড এ যে, ভালোবাসিবার
পরিণাম কে জানিত, গরল সাগরে
অবগাহন করিনু পাইতে অমৃত
আস্বাদ । হে দেবর্ষি, পুরুরবা প্রেমিক
মোর, সত্য এ প্রেম, তথাপি স্বর্গলোক
কর্মভূমি, অস্তিত্বের অংশ মোর, ভুলি
তারে কেমনে ব্যতীত হইবে সময়
মর্ত্যলোক পরে?” মুখ তুলি শুধাইলা
উর্বশী । অঞ্জনঘন আঁখি রুধিবারে
নাহি পারে, বারি ধারা রঞ্জিত কপোলে
প্লাবিত স্রোতস্বিনী হেন ভাসায় কুল ।
ক্ষণকাল মৌন রহি কহিলা দেবর্ষি,
“চিরন্তন দ্বিধা এ যে অঙ্গরা শ্রেয়সী,

কর্মভূমি মনোভূমি মাঝে কারে বরি
কারে ছাড়ি । স্বাধীনতা নহে স্বল্পমূল্য,
বিনিময়ে ত্যাগে রাজা স্বর্গ সিংহাসন ।
স্বর্গের দাসত্ব হতে মুক্ত হও আজি,
গাও জীবনের জয়গাথা । রুদ্ধদ্বার
ভাঙ্গি, প্রেমের প্লাবনে ভাসাও ধরণী ।
যদি কভু মনোবাঞ্ছা হয় স্বর্গ লাগি,
নারদের প্রতিশ্রুতি হে স্বর্গসুন্দরী,
ফিরায়ে আনিব ত্বরা মর্ত্যলোক হতে ।”
নির্নিমেষে দেখিতেছিলা আনন পানে
দেবর্ষির, উর্বশী । এতক্ষণে কহিলা,
“লইব স্বর্গ হইতে বিদায় সত্বর,
হারাইয়া কর্মভূমি নাহি দুঃখ আর,
জানি ধ্রুব সম তুমি চিরসখা মম ।”



সিডনি তে কর্মরত রবিরশ্মি ঘোষ এর লেখার জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ইংরেজি তে লেখা উপন্যাস “দ্য গডস অফ সুমেরু” দিয়ে । তারপর শুরু হয় বাংলায় কবিতা, গান, ছোটগল্প ও নাটক লেখা । লেখার বিষয় হিসাবে বিশেষ ভাবে পছন্দ ঐতিহাসিক এবং পৌরানিক পটভূমিকায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক । কবিতা লেখায় বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে আগ্রহী এবং কবিতার মাধ্যমে গল্প বলতে তার বিশেষ পছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

উপহার

আমায় একটা সুন্দর বিকেল উপহার দেবে সেই আগের মতো??
 ধূসর শাড়ীটা বদলে একটা আগুন রঙের শাড়ী পরবো,
 তোমার জন্য একটা ছোট টিপ থাকবে,
 তোমার চেয়ে থাকার মুখ্যতা আমার লজ্জা মলাট হয়ে শিহরিত ।।
 অধর ওষ্ঠ অস্থির রঙে লাল,
 গোধূলি রাঙা বিকেল তোমার স্পর্শে বাক্যহারা,
 অনুরাগের ছোঁয়ায় সূর্য ডুবে গাং মোহানায় লাজুক,
 ভালোবাসায় মিশে অন্তরাগ ।
 আমায় একটা বিকেল উপহার দেবে, সেই আগের মতো?

সেদিনের সেই সূর্য ডোবা সময় তোমার কাছে উষ্ণতা হয়ে পাবো ।
 তোমায় জড়িয়ে মেখে থাকার হাজার অজুহাত,
 দু চোখ জুড়ে মায়ার কাজল পরা ।।
 জাতিস্মরের গল্প শোনা পরজন্মের কাঁথা সেলাই,
 বিকেল মানে বিসমিল্লাহ আর গাছের জানে জানান ।।
 তোমার হেঁটে চলা পথে একটু ডানা মেলতে পারা ।।
 একটা বিকেল উপহার দেবে সেই আগের মত?
 একটু ভালোবাসতে চাই ।।



স্নেহাশিস ভট্টাচার্য । কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী । বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত । বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা । পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বৃষ্টি সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে । সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে...

উদালক ভরদ্বাজ

আমৃত্যু

বসন্তের মরসুমে বিষণ্ণ
প্রহর উপহার দিত যে, তাকে আজ খুব বেশী করে মনে পড়ে।
জীবনের প্রত্যহকে নীল জল আচমনে ভিজিয়ে
দুঃখের নদীর থেকে উঠে
আমার আর্ত চোখে শান্তিজল ছিটিয়ে
চলে যেত সে, ভঙ্গির গ্রীবার পাশে
তার সেই হাসি আজ বড় দুর্লভ মনে হয়।
দুর্লভই তো . . .

“দুর্বিষহ বলে কিছু নেই,
তুই কতটা নিতে পারিস তুই নিজেই জানিস না”
বার বার বলত আমায় . . .
আমি বলতাম “ভেঙ্গে যাব, আমি পারব না
তোমার মত দুঃখ সহিতে”।
দু চোখে নিবিড় হয়ে, কবিতার মত
আমার হাত দুটো তুলে নিত
“আমার মাথায় একটু হাতটা রাখ না পৃথু !”

স্মরণের অবিস্মরণীয় আকাশে আজ বড় মেঘ রুনি
তোমার রাগ, অভিমান, কোন দিন সে ভাবে দেখি নি
অথচ আজ ভাবি, তোমারই গানে অমৃত ছিল
তোমারই চোখে সমস্ত বাসনা।
তোমারই হাতে সঁপার ছিল
ছিন্ন জীবন।

আমাকে আকাশ দিতে চাইলি রুনি,
আকাশ করে দিতে পারলি না ?
তোমার মত, দুঃখের আকাশে, নীল,
ঘুরে ঘুরে আমিও উড়তাম না হয় !
“ভালবাসা পিদিমের মত”
“ভালবাসা আগ্নার মত”
“ভালবাসা যন্ত্রণার মুখ চেয়ে সব চেয়ে কঠিন ব্রত”
কিছুই বুঝি নি তখন
অথচ দেখ, এখন শূন্য সোপানে ঘুরে ঘুরে
সারাদিন স্বপ্ন দেখি, তুই নেমে আসছিস . . .

আমার বুকের গভীরে,
আমার ক্লান্ত নীল চোখের অতলে,
ফিরে আসা পায়ের নূপুর তোমার
বেজে বেজে, নিভে নিভে
বেজে ওঠে আবার, আবার . . .
রাত্রি ভর . . .

অতীশ ব্যানার্জী

অর্থহীনস্মন্যতা

আমার নামের অর্থ ছিলো ভিজ়ে শীতের পদ্মপাতা ।
 বৃষ্টিফোঁটা ধরে রাখার সাহস আমার নেই,
 তাই আমি ভিজ়তেই ভালোবাসতাম
 সব আর্দ্রতা আমার গা ছুঁয়ে হারিয়ে যেতো

অন্য দেশের হাওয়ায়
 রেলের গাড়ী সাড়া দিয়ে যেতো রোজ
 আমি স্বপ্নে তলিয়ে যাওয়ার আগে,
 গুণে রাখতাম কটা ফড়িং এলো ।
 সূর্য ডোবার আগে আসতো দুষ্টু মাছের দল
 ওরা জানতো আমার নামের অর্থ ।
 আমার নামের অর্থ ছিলো ভিজ়ে শীতের পদ্মপাতা ।

শেষ বিকেলের মিথ্যে আলোর রঙে
 সবাই যখন রঙ পাল্টে রাঙা
 অনেক বড় রাত্রি আসার আগে
 জলের মানুষ সাঁতরে খোঁজে ডাঙা

তেমনি সময়ে আমার ঘরের আকাশ
 টুকরো টুকরো মিথ্যে মেঘের ভেলা
 বন্দী রেখে গান শুনিও আমায়
 দেখা যখন হবে বিদায়বেলা ।

যে বৃষ্টির নদী হওয়ার সাহস
 জন্ম দেবে প্রথম ফুলের কুঁড়ি
 রাস্তার নেই মানে খোঁজার তাড়া
 সত্যির নেই মিথ্যে ছড়োছড়ি ।



অতীশ ব্যানার্জী একজন সাদামাটা বৈচিত্রবিহীন জীবনযোদ্ধার পোষাকী নাম । বর্তমানে শিকাগো প্রবাসী । আপাতত প্রাইভেট সেক্টরে কিছু অর্থহীন পাপড় ভাজছেন । শর্টে বলতে গেলে কলকাতার দই শিকাগোর বরফে জমে কুলফি । কিন্তু জুলফি ধরে টান দিলেই বোরোলিনের মতো কলকাতা, বন্ধুপ্রীতি, আড্ডা, সিনেমা, গল্প আর কবিতা প্রেম বেরিয়ে আসে । ভাল বাসেন বাজে বক্তে, খেতে আর খাওয়াতে । কোয়ালিটি মনস্কতা এবং তীব্র পাঠক প্রেমের দরুন কবি অতীশের কবিতার সংখ্যা অতি নগন্য । তাই তিনি পাঠক কুলের কাছে একজন ভয়ানক জনপ্রিয় কবি । নিন্দুকেরা বলেন অলস ।

আনন্দ সেন

পাগলা ঘোড়া

আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলো
তোমারও কি হারানো প্রেম ছিল
খাতার পাতায় প্রায়ই যাকে দেখি

রোজ বিকেলে যাবার সময় হলে
দেখতে কি তার ভরা চোখের কূলে
আকাশ জুড়ে আসন্ন বৈশাখী ?

স্নানের পরে ছড়িয়ে চুলের গোছা
উঠোনে সে করত ধোয়া মোছা
বেড়ার ফাঁকে ঠিকরে আসা রোদ

থাকত বসে পথের দিকে চেয়ে
জানলাতে মন আটকে রেখে দিয়ে
বৃষ্টি যখন তুলত খরার শোধ

আচ্ছা বলো চলন্ত ভীড় বাসে
সেদিন কি সেও দাঁড়িয়ে ছিল পাশে
তোমার হাতে তখন কি তার বাহুর পরশ ছিল?

হাতও তখন জানে
মরার কি হয় মানে
পায়ের তলায় সাঁকো কি হয় হঠাৎ টলোমলো?

আচ্ছা, সেও দাঁড়াতো ছাতে
হজমি গুলি, কুলের আচার মাখিয়ে মুখে হাতে
যখন গালের উপর একমুঠো মেঘ ছুঁইয়ে দিত তুলি?

তুমিও কি সেই হাওয়ায়
ফুরিয়ে গেছ চাওয়ায়
তোমারও কি হিসেব নিকেশ গ্যাছে জলাঞ্জলি?

লুকিয়ে তাকে রেখে
মনের মধ্যে ঢেকে
তবে তুমি হাবিজাবি কি কবিতা লেখো ?

আকর্ষণ মাঝরাতে
হৃদয় রাখো হাতে
ভালবাসার গল্প তুমি জয়ের কাছে শেখো ।
আচ্ছা এবার বলো
এরপরে কি হল
ঘটল কি তাই যেমন বলা গল্প উপন্যাসে?

অনন্ত রাজপথে
হেঁটেছ একসাথে
মিলিয়ে গেছ অজান্তে তার নিত্য বারমাসে?

কি যে বলো, তাই কখনও হয়
এতদিনে এসব কথা জেনেছ নিশ্চয়
সব শুরুই আছে একটা শেষ

কখনও সে ধীরে ধীরে যায়
কখনও বা আগুন তাকে খায়
পোড়াকাঠে হয়ত থাকে এক ফাগুনের রেশ ।

আমিও এখন তাই
কুড়িয়ে নিয়েই ছাই
একলা ঘরে চুপিসাড়ে স্মৃতির কাছে খোঁজ

প্রেম গিয়েছে কবে?
তা কয়েক বছর হবে
বৃষ্টি এলে জানলা এখন বন্ধ করি রোজ ।

এখন না হয় সেসব কথা থাক
সে যদি আজ যাবেই চলে, যাক
রেখো না চোখ বিষণ্ণ দূরবীনে ।

এসো বসি চাঁদের তলায় তবে
অল্প কথায় গল্প অনেক হবে
আজকে তোমায় সবটা বলতে পারি

বরং বলি তোমায়
কেমন করে আমায়
এক মুঠো ভোর ভরিয়ে ছিল ঋণে ।

যে অঘ্রাণে বৃষ্টি নেমেছিল
সেখান থেকে শুরু করাই ভাল
চিতার আগুন নিভতে খানিক দেরি ।



Ananda Sen — Ananda is a Professor of Biostatistics at University of Michigan. Ananda also passionately pursues the hobby of acting whenever he can. When feeling stressed, he takes recourse to the Ahrho keyboard on his desktop and types up Bengali poems. He is a regular contributor to Batayan. Ananda lives in Ann Arbor, Michigan with his wife and two kids.

মানস ঘোষ

তিন অনু কবিতা

সমান্তরাল -

আলোর যেমন ছায়া পড়েনা,
ছায়ারও নিজের আলো নেই ।
সমান্তরাল পথের ফলকে
খোদাই করেছ, - ‘ভালো নেই ।’

ফেংগুই -

তুমি তো শুনেছি সর্বৎসহা,
একাই একশো ছুঁইছুঁই !
নীল থইথই নীড়ে কেন তবে
হাসছে বুদ্ধ, - ফেংগুই ?

দাগ -

যে নদীর বাঁকে পথ হারিয়েছো,
দাগ ধরে ফেরো বারবার ।
কবিতার মতো অনিঃশেষ হয়ো
ছন্দের মতো দুর্বীর ।



মানস ঘোষ । মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের “ট্রেনচালক” । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ব করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা ‘বাতায়ন’ পাশে, আমাদের মাঝে ।

তন্ময় চক্রবর্তী

“অমলকান্তি রোদুর হতে চেয়েছিল”

চোখ বন্ধ করে সোফায় বসে আছেন ভাদুড়িমশায়। সিবিআইয়ের প্রাক্তন গোয়েন্দা। বেঙ্গালুরুতে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে। এই বাড়িতে ঢোকার সময় দরজা খুলে দিয়েছিল তাঁরই অ্যাসিস্ট্যান্ট কৌশিক। সে অবশ্য কলকাতার ছেলে। কেস জটিল হলে যে মজার মানুষ সদানন্দ বসু মাঝেমধ্যে তাঁর সহযোগী হতেন, তিনিও খুব বিমর্ষ। একসঙ্গে তো তাঁরা কত রহস্যেরই সমাধান করেছেন। কামিনীর কণ্ঠহার, জাল ভেজাল, আরও কত কি। ভাদুড়ি বাবুর সামনে খোলা ক্রসওয়ার্ড পাজলের পাতা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আর কাজ করে কী হবে? আমার রহস্যভেদ লেখার আর লোক রইল না। নীরেনবাবু আজ সকালেই চলে গেলেন’।



ভাদুড়িমশায়ের বাড়িতে গ্রাম থেকে বেড়াতে এসেছে একটি ছোট্ট মেয়ে। বাংলায় লেখা টিনটিন নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আমারও মন খারাপ হল। আমরা যারা পাঠশালায় পড়ে বড় হয়েছি, ভাল করে ইংরেজি পড়ে গল্পের আরাম নিতে পারি না, তাদের জন্য নীরেনবাবুই তো বাংলায় টিনটিন অনুবাদ করেছিলেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা চলন্ত বাসে হুট করে উঠে পড়লাম। সামান্য রোদ উঠেছে। আজ বড়দিন। রাস্তায় ট্র্যাফিক তেমন নেই। ‘লাল বাতির নিষেধ ছিল না’। অথচ আমি দেখছি,

“স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে

টালমাটাল পায়ে

রাস্তার এক পার থেকে অন্য পারে হেঁটে চলে যায়

সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক শিশু”।

কলকাতার যিশু চলে যাচ্ছেন, বড়দিনের আলো ম্লান। আমিও ঝপ করে নেমে পড়লাম রবীন্দ্রসদনে। ওখানে কবিদের ভিড়। তিনটে ক্লাস বসেছে কবিতার। ‘কবিতার ক্লাস’, ‘কবিতার কী ও কেন’, ‘কবিতার দিকে’। কবিকঙ্কণ আর ক্লাস নেবেন না। তাই বাংলা কবিতার তিন ছন্দ অক্ষরবৃত্ত/মিশ্র কলাবৃত্ত/তানপ্রধান ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত/কলাবৃত্ত/ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, স্বরবৃত্ত/দলবৃত্ত/স্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ যারা ভাঙতে চান, যাদের মনে সন্দেহ, সব ছন্দই কি সিলেবিক, কে পয়ার, কে মহাপয়ার? পদ, যতি, যতিলোপ... পদ্য লেখার এসব খুঁটিনাটি নিয়ে তরুণ কবিরা খুব চিন্তিত। কবিতা কী, কবিতা কেন, কবিতা কোথায়, কবিতা কীভাবে এবং কঠিন কবিতা এসব নিয়েও ভাবনায় প্রবীণ কবিরা। ছোটদের বইয়ের দোকানে সাজানো ‘সাদা বাঘ’, ‘গঙ্গা যমুনা’, ‘শুরুর থেকে শুরু’, ‘বারোমাসের ছড়া’।

স্পর্ধিত তরুণ কবির হাতে ‘কবিতার বদলে কবিতা’। মফস্বলের ছোট দোতলা বাড়ির রান্নাঘরে পাশে ভেঙে পড়া বইয়ের তাকে সযতনে সাজানো ‘নীল নির্জন’, ‘অন্ধকার বারান্দা’, ‘প্রথম নায়ক’, ‘নীরক্ত করবী’, ‘নক্ষত্রজয়ের জন্য’, ‘পাগলা ঘন্টি’, আরও কত কি। ‘সময় বড় কম’ তাই ‘ঘুমিয়ে পড়ার আগে’ যাবতীয় ভালবাসাবাসি ছড়িয়ে দিলেন ‘উলঙ্গ রাজা’...

“গল্পটা সবাই জানে।

কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে

শুধুই প্রশস্তিবাক্য-উচ্চারক কিছু

আপাদমস্তক ভিত্তি, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ

স্তাবক ছিল না।

একটি শিশুও ছিল।

সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু”।

জানাতে কুণ্ঠা বোধ হয়, তবুও লোভ সামলাতে পারিনা। ২০১৪ সাল। ৮ ফেব্রুয়ারি। সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় আমার হাতে “সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি কৃতিবাস পুরস্কার” তুলে দেওয়ার সময় কবি মিষ্টিমুখে বলেছিলেন, “গুরুভার। সামলে রেখো”। আরও একবার “কৃতিবাস ৬০”-এর অনুষ্ঠানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। গল্পছলে জানিয়েছিলেন, কীভাবে সুনীলদা কবিতা নির্বাচন করতেন। অনেকটা সময় সেদিন তাঁর সঙ্গী ছিলাম। যেটুকু বুঝেছিলাম, যতই অন্তর্মিল মধ্যমিল মেলাই না কেন, ছন্দের ক্লাসের জন্য তাঁর কাছে যাওয়া আমাদের বড় প্রয়োজন।

“হঠাৎ যেন একটানে কেউ সকল দৃশ্য সরিয়ে নিল”

“হঠাৎ হাওয়া উঠেছে এই দুপুরে”

“হয়ত দাঁড়িয়ে থাকবে কেউ”

“হলে হবে, না হলে না হবে”

“হাজার জীর্ণ শীত পার হয়ে এলে তারপর”

“দু’দণ্ড দাঁড়াই ঘাটে”

“বন্ধুরা দুঃখের দিনে দূরে থাকো”

“যায় যায় সমস্তই যায়”



কবি তন্ময় চক্রবর্তী। পেয়েছেন কৃতিবাস, মহাশ্বেতা দেবী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পুরস্কার ও পদক। কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত ৯ টি। তারমধ্যে ‘ডোভার লেনের রাত্রি’ (সিগনেট প্রেস), ‘আমার রবিঠাকুর’ (প্রতিভাস) বিদগ্ধ পাঠক মহলে সমাদৃত। দেশে ও বিদেশের নানা সাহিত্যসভায় ওনার কবিতা পাঠ বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

ভোর – জানালার বাইরে

“সূর্যোদয়ের আগে গান ধরে ভীমসেন যোশী

কোমল রেখাবটাকে ভাবলেন দারুণ রূপসী”

কোন কোন ভোরে আহির ভৈরবের সুরে বাঁধা হয়ে যায় মন। সেই ভোর অপরূপা। আবার কোন কোন ভোর আসে আকাশ জোড়া মন খারাপ করা মেঘ নিয়ে। মেঘের ঘনঘটায় আজও বিরহী যক্ষের বেদনায় বিধুর হয়ে ওঠে কর্মব্যস্ত প্রবাসী হৃদয়। জানালার বাইরে মেঘ ঘরে ফেরার আর্তি জাগায় মনে? নাকি মনে করুণ সুর বাজলেই মন খারাপ করা মেঘে ঢেকে যায় আকাশ? দুটোই সত্যি। মনের জানালা দিয়ে জানালার বাইরে দেখা ভোর। তাই এক এক ভোরের এক এক রকম আমেজ।

নভেম্বর, শিকাগো, আমার শোয়ার ঘরের জানালার বাইরে ভোর

স্ফটিকস্বচ্ছ আকাশ। শেষরাতের আলো আঁধারির চিহ্নমাত্র নেই। কোন দরজী যেন নিপুণ হাতে অন্ধকার কেটে দিচ্ছে কাঁচি দিয়ে। তার পায়ের কাছে কালো কাপড়ের মতো জমা হচ্ছে রাত্রি। দূরের আকাশে জ্বলজ্বল করছে একটা মাত্র তারা। তারা, নাকি শুক্র গ্রহ? সে মীমাংসায় কাজ নেই। এতখানি আকাশ জুড়ে এই ভোরে নিঃসঙ্গ এই তারা। পৃথিবীর অন্য গোলাপে আমার মা এখন কি করছেন একা একা? গোধূলির আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন হয় তো। সেখানে জানালার বাইরে এখন পড়ন্ত বিকেল। রবিশঙ্করের সেতারে “পুরিয়াকল্যাণ”।

জুলাই, ফ্লোরিডা, মেক্সিকো উপসাগরের ওপর ভোর

হোটেলের বিশাল কাচের জানালার পারে অতল জলরাশি। কাল চাদরের মতো। সেই চাদরের ওপর সাদা সুতোর জড়ামরি – ঢেউ এর ফেনা। সেই ফেনায় আর লোনা গন্ধে সাগরের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। এক বিশুদ্ধ ভোর। ধীরে ধীরে পূব আকাশে নতুন সূর্যোদয়ের প্রস্তুতি। গোলাপী, নীল আর বেগুনী রং ফুটে উঠছে আকাশের গায়ে। সময় নিচ্ছে সে রং আকাশের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে। ঠিক যেন ক্যানভাসে পরম যত্নে তুলির টান দিয়ে চলেছেন এক চিত্রশিল্পী – তাড়া নেই, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। রং, তুলি নিয়ে খেলার আনন্দে ঐকে চলা এই ভোর। ক্রমশঃ ফুটে উঠছে। “বাবুল মোরা নাইহারে ছুট না যায়ে” – ভৈরবীর আলাপ থেকে বিস্তারে গড়িয়ে চলেছে সকাল।

মার্চ, ব্যাংককের রাস্তায় ভোর

ঘুম ভাঙল কোকিলের ডাকে। অনভ্যস্ত কান সময় নিল বুঝতে। ভোর কি তাহলে শুধু বর্ণময় নয়? শব্দময়ও বটে। “বৈরী কোয়েলিয়া কুক শোনাওয়ে/ মুঝ বিরান কা জিয়ারাজুলাওয়ে”। এইরকম কোকিলডাকা ভোরে ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে। হোটেলের ঘরের বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চেনা ভোর। অনেকটা কলকাতার মতো। আকাশে রঙের নাটকীয় ঘনঘটা নেই। ঝাপসা সূর্য। নীচে করবী, জবা, টগর আর গোলপা ফুলের রং বাহার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। থরে থরে সবুজের বিস্তার সেই হলুদ, লাল, সাদা, গোলাপী ঘিরে। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছেন স্থানীয় থাই পুরুষ। সরাসরি বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ছে একটা ভোর।

জুন, গ্র্যান্ড টিটন ন্যাশানাল পার্কে ভোর

জুন মাসেও Teton চূড়া বরফ ঢাকা। শেষরাতের হালকা অন্ধকারে গোটা পর্বতমালা স্তব্ধ। ধ্যানরত যোগীর মতো গম্ভীর, স্থির। ভক্তের আকুতি নিয়ে ভোরের অপেক্ষা। অন্ধকারের উৎস থেকে আলোর উতসারণের অপেক্ষা। এই ভোর হতাশ করে না। সাদা বরফে আগুন গোলাপী আভা ছড়িয়ে সোনালী সূর্যোদয়। মহিমাময় ভোর। স্রষ্টার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা ভোর। ঘন নীল আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ। নতুন সূর্যের রঙের ছোঁয়ায় স্বপ্নময়। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঝিলিক দিচ্ছে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিময় এক ভোর।



রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় — শিকাগোর বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। আর নেশায় পড়ুয়া। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত। রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি। রঞ্জিতা ‘বাতায়ন’ পত্রিকার সম্পাদিকা। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন ‘লিটল ম্যাগাজিনে’ ওনার লেখা বের হচ্ছে। শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত। সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে — “Bugging Cancer” আর “Three Daughters Three Journeys”। সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার।

“মধ্যদুপুরের পথে হাঁটছি আরামে

গঙ্গনে রোদ্দুরও যেন চাঁদের আলোর মতো ঠান্ডা

চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কোনদিকে তবে যাই

সবকটাই রেড রোডের মতো চওড়া আর লম্বা আর ধু ধু

কখনো কখনো শরক্ষিপ্ৰতায় ছুটে-যাওয়া এক-একটা গাড়ি

গায়ে বাপটা লাগিয়ে বেরিয়ে যায়।

তার পাশ দিয়ে একা-একাই হাঁটছি আমি

হাতে একটা ঘোর কালোরঙের কুঁজো

দরকার হতে পারে ভেবে তাতে আলো ভরতে ভরতে চলেছি।”

— শঙ্খ ঘোষ

“কালোরঙের কুঁজো”

প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে

শাশ্বতী নন্দী

নদীর বাঁক যেন ডাকে ফিরে ফিরে

মেয়েটির নামে হতে পারে সুচরিতা কিংবা প্রিয়ংবদা, কিংবা অনুসূয়া, কিংবা শাশ্বতী। এ লেখার চরিত্রটি তাদের মধ্যে কেউ একজন হতেই পারে যারা দক্ষিণ কলকাতার এক সময়ের নামী স্কুল, যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুলে পড়াশোনা করে গেছে। এই লেখায় কিছু পর্ব আছে বা বাঁক, যেমন থাকে নদীর। স্রোতের টানে এগোতেও নদী সেই বাঁক মাঝে মাঝেই ঘুরে দেখে, হয়তো খোঁজে পেছনে ফেলে এলো কিনা কিছু।

আমি শাশ্বতী নন্দী, ১৯৮২-র মাধ্যমিক ব্যাচ, আমারও আজ ইচ্ছে করছে ফেলে আসা পেছনের বাঁকগুলো ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নিতে।

শুরু করি সেই দিনটা দিয়ে, যেদিন এই ছোট মেয়েটার কচি আঙুলগুলো পৈঁচিয়ে রেখেছিল বাবার আঙুল, আর ওর চোখে তখন এক পৃথিবী বিশ্বাস। ‘বাবা, এতবড় মাঠ! এখানে আমি খেলব?’

— নিশ্চয়ই, ধারে ধারে কী সুন্দর বাগান, দ্যাখ। কত ফুল, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, পিটুনিয়া।

— বাবা, আমি এক ছুটে প্রজাপতির ডানা ধরে আসি?

— হা হা হা। সব করবি মা। এবার ভেতরে যা, একটু পরেই ঘন্টা পড়বে।

— তুমি যাবে না? ও বাবা? আমি কার সঙ্গে খেলব তাহলে? চলে যাচ্ছো কেন? বাবা!

বাবার হাত ক্রমশ শিথিল হয়, শিশু আঙুলগুলো নিজের আঙুল থেকে ছাড়াতে চায়। আমি কেঁদে ভাসাই, ‘আমি মাঠ চাই না, খেলতেও চাই না। প্রজাপতিও ধরব না। স্কুলেও পড়ব না। আমি শুধু তোমার সঙ্গে থাকব বাবা’।

বাবার মুখ ফ্যাকাসে সাদা, দু পা হাঁটে আর পেছনে তাকায়। কেমন যে করে মেয়েটা। এভাবে ছেড়ে যেতেও যে কষ্ট হয়।

— অ্যাঁই খোকি, এসো, আমার সঙ্গে এসো। বাবাকে ছেড়ে দাও। চলো আমি তোমাকে অনেক বন্ধুর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

খাকি পোশাক গায়ে মোটাসোটা এক মাঝবয়সী লোক এগিয়ে আসছে। ঠোঁটখানা পানের রসে চোবান যেন, কথা বললেই মুখ থেকে ভুরভুর করে পানের গন্ধ আসে। আমি ছুটিছি বাবার হাতটা আবার আঁকড়ে ধরব বলে। ওমা, সে মানুষটা তার আগেই আমার হাতখানা, খপাৎ। বাবা এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত, কিংবা নয়। চলে যাচ্ছে গেটের বাইরে, তবু দৃষ্টি পেছন পানে। যতক্ষণ খুকি মেয়েটিকে দেখা যায় আর কী। আমিও ঘাড় ফিরিয়ে কেঁদেই চলি, ‘বাবাকে ডাকো না?’

— আরে, এই খোকি, বোকা মেয়ে তুমি? বাবা তো অফিস যাবে, এই তো আমি আছি, তোমার গাজিয়াদা। চোখ মোছ, আবার কাঁদে। ঠিক আছে, ছুটির সময় তোমাকে আমি অনেক ফল দেব।

আমি হাপুস হয়ে কেঁদেই চলেছি। কিন্তু এবার কান্না যেন থমকালো একটু, ‘ফল? কী ফল? আমাকে দেবে? ঠিক তো’।

একদম ঠিক। চলো ক্লাসে চল। এখন ঘন্টা পড়বে।

বাবার হাত ছেড়ে গাজিয়াদার হাতে আমি সেদিন পেয়েছিলাম পিতার মতো স্নেহ, ভরসা, প্রশয়। ধীরে ধীরে বড় হলাম,



গাজিয়াদা বুড়ো হল আর গেটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটা বৃদ্ধ গাছ হয়ে উঠল। গাজিয়াদার কাছে তবু টক ফল পেড়ে দেওয়ার বায়না কমল না। তার হাতের লাঠিটা এবার আর একটু মোটা সোটা হয়েছে। তার শরীরের অনেকখানি ভার ওই লাঠি বয়ে বেড়ায়। তবু সে গাছের ডালে লাঠির ঝোঁচা দেয় আর বুরবুর করে ফল ঝরিয়ে দেয় মাটিতে।

স্কুলের সবুজ ঘাসের ইয়া বড় মাঠটাও ক্রমশ আত্মীয় হয়ে উঠল আমাদের কাছে। আহা, সবুজ কার্পেট যেন। হাঁটতে কী মজা, বিশেষ করে শীতের রোদ্দুরে। ঘাসগুলো তখন চকচকে। বনবন করে আমি ঘুরেই চলি বন্ধুর সঙ্গে, কত ফিসফিস কথা। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় পা দুটো যখন ক্লান্ত, মনে হয়, আহা একটু বিশ্রাম নিলে বেশ হত। কিন্তু কোথায়? তখনই চোখে পড়ে, আরে ওই তো একটা কৃষ্ণচূড়া, পাশে রাখাচূড়া হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে। কী প্রেম বাবা! মাঠটা নিশ্চয়ই রোজ ওদের প্রেমকথা শোনে।

আমি ফিসফিস করি বন্ধুর কানে, ‘অ্যাই আমারও একটা প্রেম হয়েছে জানিস? ঠিক বিকেল ছটায়, ওই যে রে যখন রেডিয়েতে অনুরোধের আসরে আরতি মুখোপাধ্যায়ের গানটা হয়, ও কী করে বোঝে রে, আমার তখন প্রেম পায়? ঠিক পাস করবে বাড়ির পাশ দিয়ে’।

— এই-ই সেম, আমরাও তো।

আহা, দুই বন্ধু তখন কত গলগল কথা, কত আহ্বাদ। ঠিক সেই সময়ই রসভঙ্গ।

— অ্যাই তোরা চল। নন্দিতামিস ডাকছেন। — মাতব্বর মতো এক মেয়ে এসে হাজির। — প্র্যাকটিস শুরু হবে। প্রথমে ড্রিল প্র্যাকটিস, ব্যাস্ ড্রিল, হুপস ড্রিল। তারপর ওই কমপিটিশনের খেলা। স্যাক রেস, ফ্রফ রেস, জ্যাভলিন থ্রো, সফট বল থ্রো। শিগগির, না গেলে ভীষণ বকুনি খাবি’।

হ্যাঁ, জানুয়ারি মাস মানেই মনে হত মাঠের জন্মদিন। তাকে ঘিরে খালি সাজ, উৎসব আর খেলা। সামনে স্পোর্টস ডে না! রিবন ড্রিল যখন হত, নানা রঙের ফিতে উড়ত বাতাসে, মনে হত একসাথে নানা রঙের কত পাখি উড়াল দিল আকাশে। সঙ্গে গুম গুম ড্রামের আওয়াজ। ঠিক যেন সাঁওতালি গ্রাম থেকে মাদলের শব্দ। নন্দিতাদি ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছেন সব, নিখুঁত পরিচালনা।

কিন্তু আমাদের দুই বন্ধুর বেজার মুখ, ‘ধুস, পুরো গল্পটা যে শেষই হল না’।

— চ, পালাবি? কোথায়, কোথায়? ওই যে পেছনের মাঠের খাঁচায়। কেউ দেখবে না। কেউ দেখবে না। ওখানে চড়ে বসি, ওখানেও এতবড় ছায়া আছে গাছের।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। পালাতে যাব, ঠিক তখনই কেউ একজন মিসের কানে তুলে দিয়েছে কথাটা। ব্যস, আর কী, কাঁচুমাচু মুখে কাঠগড়ার আসামীর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম দুজনে। উনি রাগী চোখে তাকালেন, কিন্তু বকলেন না। শুধু নিদান দিলেন, “কাল যেন প্র্যাকটিসে আসা হয়। যাও’।

শান্তিটা এত কম! আহ, আমাদের পায়ে তাই তেঁতে নৃত্য। আবার যাবি ওই খাঁচায়?

নদীর বাঁক আস্তে আস্তে ফুরোতে চায়, তাহলে কি জীবনটা ছোট হয়ে আসছে? আজ reunion এ এসেছি আমি। প্রথমেই ছুটে গেলাম সেই মাঠে। আচ্ছা, কদম গাছটা আছে? সেই কদম গাছ জানলা দিয়ে হাত বাড়ালেই মনে হত, এই তো, এই তো, আর একটু। তাহলেই ব্যস, কদমফুলটা একেবারে মুঠোয়। উফ, কী বকুনিই না খেয়েছিলাম একদিন তুলসী মিসের কাছে। বোর্ডে তখন insector, bisector, tangent, chord, এর যুদ্ধ চলছে, আর আমার সব ঈঁশ তখন কদম গাছে।

আর জিওগ্রাফির যুথিকা মিস। অ্যাটলাস খুলতে বললেই মন নেচে উঠত। আহা, গোটা অ্যাটলাসটাই যেন এক

রূপকথার দেশ। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, একেক দেশের একেক রঙ। মনে মনে ভেবে রাখতাম, হলুদ দেশটা সব চাইতে আগে ঘুরতে যাব, তারপর কমলা, তারপর বেগুনি...

আহা, এখন তো কত দেশ বিদেশ ঘুরি, কিন্তু একটাও রূপকথার দেশ চোখে পড়ে না কেন?

হঠাৎ মনে পড়ল, আর কোথাও যাই বা নাই যাই, একবার মিউজিক রুমটা দেখে আসতেই হবে। ওই তো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়, সবার থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আমাদের ওই গানঘর। পা দিলেই মনে হত কোন অদৃশ্য তানপুরায় একসঙ্গে বেজে উঠল অনেক সুর। একটা বগোনভিলিয়া লতিয়ে উঠেছিল ওই গানঘরের রেলিং বেয়ে।

কিন্তু যেতে যেতেও পা থমকে যায়। ওই সুর খুঁজতে গিয়ে যদি দেখি সুরগুলো হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, অসম্ভব তো নয়। এই তো, কদিন আগে, গানের মৃন্ময়ী মিস চলে গেলেন। হয়তো সব সুর সঙ্গে নিয়ে চলে গেছেন। না, না, তা কখনও হয়? এই স্কুল তো ঠুঁদের সম্পদ। সঙ্গে করে কেউ কিছুই নিয়ে যান নি, বরং দিয়ে গেছেন অনেক কিছু।

আমি চলতে শুরু করলাম গানঘরের সিঁড়ির দিকে। দেখি কিছু কাঠ পিঁপড়ের সারি চলেছে আমার আগে আগে। ওরা কি পথা চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? হা হা হা। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসি। ঘাড় উচিয়ে তাকালাম একবার ওপরে, ওই তো ঘরটা। তালা বন্ধ কি? নাকি দরজা আলতো ভেজানো। ধাক্কা দিলেই খুলে যাবে, আর ভেতরে গিয়ে দেখব চেয়ারে বসে আছেন মৃন্ময়ী মিস।

নিজের গুনগুন সুরে নিজেই বিভোর। দূরে তানপুরা হাতে অন্য কোনও ছাত্রী।

সিঁড়িতে পা রাখতেই গায়ে শিহরণ। কত বছর পর... সিঁড়ির চেহারা এখন চটা ফাটা। তা হোক, মন্দিরের সিঁড়ি, সব সময়ই পবিত্র। পা রাখার আগে ঝুঁকে প্রণাম করতে হয়। এই গানঘর ছিল আমাদের কাছে মন্দিরের মতো।

হঠাৎ একটা সুর, হ্যাঁ সুরই তো। আমি ঘাড় ফেরাই। কোথ থেকে আসছে সুরটা? গানঘরে থেকে কি? আমি ছুটে ছুটে চলেছি। একটা চুম্বক শক্তি আমায় টেনে নিয়ে চলছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে গানটা চিনতে পারলাম। মৃন্ময়ীমিসের প্রিয় গান, ‘শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা। শুধু আলো আঁধারে, কাঁদা হাসা’।

কিন্তু আশ্চর্য, এখনও কেন মনে হচ্ছে সুরটা দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে? অনেকক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কী যে হল, ধীর পায়ে নীচে নামতে শুরু করি। থাক, ভেতরে যে সুর বইছে, তাকে নিজের মতো ভেসে বেড়াতে দেওয়া উচিত। কে জানে, হয়তো মৃন্ময়ী মিসই ভেতরে সুর সাধনায় বসেছেন। অনেক আলোকবর্ষ দূর থেকে ভেসে এসেছেন তাঁর এই প্রিয় গানঘরে। ঠাঁর ধ্যান ভঙ্গ করার অধিকার আমার নেই।



শাশ্বতী নন্দীর জন্ম ৮ আগস্ট, ১৯৬৬। শিক্ষা-দীক্ষা-কর্ম কলকাতায়। বিজ্ঞানের স্নাতক। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনে বিশেষ পদে কর্মরত। প্রথম উপন্যাস ‘বসন্ত অফুরান’, শারদীয়া সানন্দা, ২০১৪ সালে প্রকাশিত। এছাড়াও ছোটগল্প, ‘বৃষ্টির গন্ধ’, ‘গোল্ডফিস’, ‘অমলতাস’ (দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) পাঠক-অভিনন্দিত। প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘স্বপ্ন বলাকা’, ২০১০ সালে বেহালা বইমেলায় শহিদ প্রদ্যোৎকুমার স্মৃতি উৎকর্ষ পুরস্কার লাভ করে। প্রশংসিত হয়েছে ২০১৩ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ ‘যখন বৃষ্টি এল’। তাঁর গল্প অবলম্বনে আকাশবাণী কলকাতায় তিনটি নাটক সম্প্রচারিত।

দেবীপ্রিয়া রায়

নিয়ম কানুনের গোলকধাঁধায়

ছেলেবেলা থেকেই নিয়ম কানুন ব্যাপারটা আমাকে ঘোল খাইয়ে দেয়। তার মানে এই নয় অবিশ্যি যে আমি নিতান্ত বেনিয়মের বন্নাছাড়া মানুষ। কিন্তু আমি লোকটা একটু ঢিলেঢালা গোছের। ধান শুনতে আখছার কান শুনি, সোজা রাস্তায় হাঁটতে গিয়েও মাঝে মাঝে হারিয়ে যাই। কাজেই কোনটা নিয়ম, কোনটাই বা অনিয়ম, এর হিসেব রাখতে ভারি ধাঁধা লাগে। ছোটবেলা থেকেই মাতৃদেবীকে তাঁর কন্যাটির স্বভাবের জন্য হা হতাশ করতে দেখেছি। “অন্য বাড়ীর ছেলে মেয়েরা যে কি পরিমাণ সভ্য, কাজের, বুদ্ধিমান, ইত্যাদি ইত্যাদি” (– ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর হতাশের বয়ান পালেট পালেট যেত)।

আমাদের পরিবারে আবার নিয়ম কানুনের ব্যাপারটা দুটি স্তরে ভাগ করা ছিল। যৌথ পরিবারের সর্বগ্রাহ্য আচার সংহিতাটি নির্ধারিত হত দক্ষিণ কলকাতায় পরিবারের আবাস স্থল, অর্থাৎ কিনা পরিবারের হেড অফিস হতে – পরিচালনায় থাকতেন আমার পিতামহ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীলা শ্রীযুক্তা আশালতা সেন মহাশয়া। জিতেন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে ইংরাজ সরকারের বিচক্ষণ ও সুদক্ষ অফিসার আবার পরিবার পরিজনের প্রতি পরম মনোযোগী শীর্ষপুরুষ – সকলের ভরসাস্থল। দেশভাগের পর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে গুটিকয় বাসস্থান নির্মাণ করা সত্ত্বেও তিনি আমাদের প্রত্যেককে শৈশব কালেই মুখস্থ করিয়েছিলেন, “আমাগো বাড়ী অইল বিক্রমপুরের পাটাভোগ গ্রাম, পোস্ট অফিস ষোল ঘর। অহন যেহানে থাকি, এইটা অইল আমাগো বাসা।” অর্থাৎ আমাদের জীবন ছিল নবীন প্রবীণের মেশামেশি। না দেখা আদি বাড়ী এবং যেখানে বাসা, দুটি জায়গার রীতিনীতি নিয়ে আমাদের আচার সংহিতার বিভিন্ন কোড বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, এর উপর পড়েছিল ইংরেজি শিক্ষা সভ্যতার ফিনিশিং টাচ; কিছু কিঞ্চিৎ ভিক্টোরীয় উন্মাসিকতার আদল তাতে – সব মিলিয়ে সে ভারী ঘোরতর ব্যাপার।

পিতামহের বেঁধে দেওয়া কানুন ব্যবস্থার বেশীর ভাগটার লক্ষ্য ছিল তাঁর নাতি নাতনীদের উপযুক্ত শিক্ষার ভিত গড়ে দেওয়ার দিকে। ইংরাজী ও অঙ্ক – এই দুটি বিষয়ে পোক্ত নাহলে শিক্ষা দীক্ষা বৃথা, এই ছিল তাঁর মত। আমাদের জীবনে হোমটাস্ক এবং প্রগ্রেস রিপোর্ট বিরাট ভূমিকা পালন করত, ইংরেজি শব্দের শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ, বাংলা হতে ইংরেজি translation-এ সড়গড় করতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন ও আমাদেরও করাতেন। যাদবের পাটিগণিত, কেসি বোসের আলজেব্রা, হল এন্ড স্টিভেন্স এর জ্যামিতি, আর নেসফিল্ড মশায়ের গ্রামার পুস্তিকাটি ছিল তাঁর হাতিয়ার। স্কুল কলেজের সব বিষয়ে তাঁর নাতি নাতনীদের সবার সেরা হতে হবে, এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা।

ওদিকে, আচার আচরণ, সভ্যতা ও শুচি, অশুচি, ব্রত, উপবাস এই বিভাগের সর্বময়ীকত্রী ছিলেন পিতামহী শ্রীলা শ্রীযুক্তা আশালতা সেন মহাশয়া – আমার ঠাম্মা। আমাদের বিশাল যৌথ পরিবারের কোন সদস্যের এ ব্যাপারে লেশমাত্র বিচ্যুতি তাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারতো না। জাতি, ধর্ম, শুচি, অশুচি এই সব শব্দ ছিল তাঁর কাছে জীবন্ত সত্য। এই তো গেল হেড অফিসের কর্তৃপক্ষের খবর।

হেড অফিসের একটি শাখা অফিস ছিল কাশীধামে অর্থাৎ কাশী হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবাসনে, আমাদের বাড়িতে। সেখানে কার্যকর্তা ছিলেন আমার উদারহৃদয় অধ্যাপক পিতা ও তাঁর ছায়ানুসারিণী আমার পরম স্নেহশীলা মাতা। এই শাখা অফিসটিতে অর্থাৎ তাঁদের পাতা সংসারে পূজাপাঠ অনুষ্ঠানের অভাব ছিল না। ভোর না হতেই বাবার উদাত্ত কণ্ঠের গীতাপাঠে বাড়ী গমগম করত, মায়ের পূজার ঘর থেকে ধূপধূনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। কিন্তু শুচিবায়ু বা জাতি ধর্ম ভেদ সেখানে খুঁজে পাওয়া যেত না। আমার ছোট ভাইবোনদের সাথে আমার ঝগড়া ঝাঁটি করা ছাড়া সে বাড়িতে কোন রকম গোলযোগ হত না। কিন্তু গোল বেঁধে যেত যখন পিতামহী শ্রীলা শ্রীযুক্তা আশালতার পদার্পণ ঘটত। হেড অফিস

ও শাখা অফিসের নিয়ম কানুন গুলিয়ে যা ঘটত তাকে ইংরিজিতে বলে Confusion ! । আশালতার শিক্ষা দীক্ষার অভাব ছিলনা বরং তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী । শুধু প্রখর বুদ্ধিমতীই নয়, তাঁকে বলা উচিত ধীমতি । ১৯০০ সনে জন্ম হয়েছিল তাঁর । স্কুলের পড়া ৮ম শ্রেণীর পর করা হয়নি । ততদিন পর্যন্ত সব কটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন । একটি স্বর্ণপদক ছিল তাঁর, অবরে সবরে বাক্স খুললে আমরা সেটি সবিস্ময়ে নেড়ে চেড়ে দেখতাম । ব্রিটিশ জমানার উচ্চ পদাধিকারী আমার দাদুর স্ত্রী হিসাবে তিনি নানা সভা সমিতির উদ্বোধন করতেন এবং ভারী ভাল যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন । শুনতাম যে এককালে তিনি ইংরেজি মহিলাদের ধরনে শাড়ী পরে কট্টাষ্ট ব্রিজ খেলতেন । আমরা নিজেরা দেখতাম যে তিনি কলকাতা শহরে একলা চলা ফেরা করতে অভ্যস্ত ছিলেন । নিয়ম করে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা ও পাঠ শুনে নোট নিতেন । এছাড়া রান্না বান্না অতিথি আপ্যায়ন, সেলাই, রপ্তানীর সেবা করা কোনোটিতে তাঁর কোনো ত্রুটি ছিল না । কিন্তু এহেন সর্ব গুণনিধি মহিলাটির Achilles heel ছিল তাঁর শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বভাব । ঠাম্মার জগত এঁটো সকড়ির নানাবিধ কাঁটা তারে সদাই ঘেরা থাকত । কোন যুক্তি বুদ্ধি সে বেড়া ভাঙতে পারত না । আমাদের বাড়ীতে এসে খাবার টেবিলে খেতে তিনি রীতিমত আপত্তি জানাতেন, কারণ সে টেবিলে আমরা বাঁ হাতে জলের গেলাস ধরে খাই, উপরন্তু আমি আবার সেই টেবিলে ভাত খেতে খেতে বই আর খবরের কাগজও পড়ি, যাতে সে সবই অশুদ্ধ হয়ে যায় । সে অশুদ্ধ কাগজ ঠাম্মার আর পড়া তো হয়ই না বরং তার স্পর্শদোষে সারা বাড়ি সকড়ি হয়ে যায় । আমার ভাই বলত, “এটা হল এঁটোসিটি – কার্ড জামা খাট বিছানা সব কিছুই এর পক্ষে good conductor । তাই সকড়ি তে ছুঁলেই বিদ্যুতপ্রবাহের মতই যে কোন বস্তুতে এঁটোসিটি সংঘটিত হয়ে যায় ।” তিনি আসা মাত্র আমাদের মুড়ি, চিড়ে খেলেও বিছানার থেকে দূরে থাকতে হতো, না হলে চাদর বালিশ সব কিছুর ধোপার বাড়ি যাত্রা থামায় কে ? একমাত্র আমার পোষা কুকুর টিনি ছাড়া ঠাম্মাকে সকলে সমঝে চলত । কেবল সে তার নেড়িকুত্তা সুলভ অকুতোভয় স্বভাবে মাঝে মাঝে তাঁর ঠাকুরঘরে গিয়ে শিব লিঙ্গটি চুরি করে এনে সেটি মুখে করে সারা বাড়িময় সগর্বে পায়চারি করত । বলাইবাছল্য তার পর ছলুছলু ঘটত । গোবর, গঙ্গাজল, টিনিকে অবিলম্বে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা, আমার তারস্বরে কান্না ও অনু জল ত্যাগ ইত্যাদি কয়েকদিন চলত তবে জিৎ হত আমারই । বাবা-মাও টিনিকে ভালবাসতেন সেটাই রক্ষা !

তবে ঠাম্মার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল যবন স্পর্শ দোষে । বেনারসের বাড়ীটা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাড়ী হলেও সেখানে তিনি অনেক সময়ই পুত্র আর পুত্রবধূর উদার নীতি দেখে হাল ছেড়ে দিতেন; বলতেন, “এইটা হইল শ্রীক্ষেত্র – এইখানে নিয়ম নিষেধ নাই ।” কিন্তু কলকাতার বাড়ীটি ছিল তাঁর seat of power সেই বাড়ীতে যবন নামধারী কোন অতিথি এসেছেন সন্দেহ মাত্র হলে ঠাম্মা তাঁদের প্রথমে সদ গৃহস্থের প্রথমত মিষ্টি আর ফল কেটে দিয়ে আপ্যায়ন করতেন বটে, কিন্তু তাঁরা বিদায় নিলেই স্পর্শদোষের Atom বোমা গোবর গঙ্গাজলের হাঁড়ি নিয়ে শোধন কার্যে অবতীর্ণ হতেন । গঙ্গাজল ছিল ঠাম্মার কাছে সকল দোষের রামবাণ, মানে আজকের যুগের steroid আর কি ! এ কার্যসাধনে ছোটকাকুর বিয়েতে পাওয়া বাঁ চকচকে সোফাসেটটি রং বদল করল কিম্বা মেজকাকুর শখ করে কেনা ইটালিয়ান কার্পেটটি বুটিদার হয়ে দাঁড়াল – তাতে ঠাম্মা ক্রক্ষেপ মাত্র করতেন না । কিন্তু এহেন রামবাণও ক্ষেত্র বিশেষে ফেল মেরে যেত । একটি ঘটনা বললেই ব্যাপারটা খানিক বোঝা যাবে । সেবার শীতকালে আমার ছোটকাকুদের আয়োজিত steamer party থেকে ফেরার সময় ছোটকাকু তাঁর driver হানিফকে বললেন যে, “মা’র জন্য এক কলসী গঙ্গাজল নিয়ে এসেছি, ঘরে তুলে দাও” । পুত্রের নির্দেশ ঠাম্মার কানে গেল । আমি তখন একটু একটু পূজা আচ্ছা করি । ঠাম্মা আমাকে পরম সুহৃদের মতন বললেন যে, “তুই তো পূজা করস, ঠাকুরঘরটা ছোট । তর অসুবিধা অইতে পারে, তুই বরং ছাদের ঘরে নিরিবিলিতে বইয়া পূজা কর । আমি ঐ গঙ্গা জলের ঘড়া হানিফেরে কইয়া ঐখানে রাখাইয়া দিছি ।” আমি যত বলি, “আমি এক ঘড়া গঙ্গা জল দিয়ে কি করব ?” পিতামহী ততই বলেন “আরে মাস খানেক আছস্ – খর্চা অইয়া যাইব ।” গঙ্গাজল হেন মূল্যবান ধন অকারণে আমার মত অপাত্রে বিলিয়ে দেওয়ার পিতামহীর এহেন ঔদার্যের কারণ আমিও বুঝিনা, তিনিও নিরস্ত হন না ! তর্কাতর্কি শুনে ভেতরের ঘর হতে মেজকাকী বের হয়ে এলেন । তারপর ব্যাপার বুঝে নিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, “মা গঙ্গা সকলকে এতদিন পবিত্র করেছেন । এবারে যবনহানিফের স্পর্শে তিনি নিজেই অপবিত্র হয়ে গেছেন” । শুদ্ধাচারিণী ঠাম্মার বদান্যতার রহস্য তখন খোলসা হল ।

যাই হোক, ওই গুটি কয়েক ব্যাপারে, মানে কুকুর ও গঙ্গাজলের বিশুদ্ধতা বিষয়ে পরাস্ত হলেও পরিবারে অন্যান্য ক্ষেত্রে আশালতা ছিলেন পরাক্রান্ত পরাক্রম, বিশেষ করে আমাদের চাল চলনের দিকে তিনি সর্বদাই খর দৃষ্টি মেলে রাখতেন। সেসব সময়ে চাল চলন নষ্ট করার দুটি প্রধান আসামী বলে ধরা হত যাদের, তারা হল গল্পের বই – দাদু ও ঠাম্মার রাজত্বে যার নাম ছিল “বাজে বই”, দ্বিতীয় আসামী ছিল সিনেমা, বিশেষ করে হিন্দি সিনেমা। এ বিষয়ে বিধি নিষেধ ছিল কড়া – তাতে করে আমাদের মানে পরিবারের ছোটদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কত যে ক্ষতি হত, কচি কোমল মনে কত আঘাত লাগত, তার প্রতি তাঁরা ছিলেন উদাসীন। আজকালকার যুগ হলে এর কোন নিষ্পত্তি হত কিনা বলা যায় না, কিন্তু সেকালে আমাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনা হত না, কাজে কাজেই আমরা মনোবেদনা বহন করেই বড় হয়ে যেতাম। আমার কথাই বলি। সেদিন আমাদের স্কুল পার হওয়ার শেষ পরীক্ষা – ! এইটি উৎরে গেলেই বুক ফুলিয়ে বলা যাবে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলেজে ঢুকব। বড় সামান্য ব্যাপার নয়। কত দিন ধরে এটির অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ সকাল থেকেই আমার উডুউডুমন, বইয়ের পাতায় মন বসানোই দায়। একে তো জ্যামিতি মোটেই ভাল লাগে না, বড্ড খটমট। তার চেয়েও বড় কথা আজ পরীক্ষা শেষে সব বন্ধুরা মিলে হিন্দি সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা। বলিউড নামটা তখন ভবিষ্যতের গর্ভে, হিন্দি সিনেমা কথাটাই চলত বেশী। তা সেই হিন্দি সিনেমা বস্তুটি আমার কাছে স্বপ্নের জগত। অভিভাবকেরা লারেলান্স গান আর ধাঁই ধপাধপ নাচ – মনোরঞ্জনের অমন সর্বজনপ্রিয় জিনিস দু’টিকে শিশু মনের পক্ষে বিষতুল্য মনে করতেন। অবশ্য সকল পরিবারের অভিভাবকরা তেমন নির্মম ছিলেন না। আমার বন্ধু বর্গের অনেকেই বাপ মায়ের হাত ধরে কত রং বেরঙের সিনেমা দেখে এসে আমাদের টিফিন পিরিয়ড গুলজার করত। আমার মত গুটি কয়েক হতভাগ্য শুধু চোখ বড় করে সে সব গল্প শুনত। এক্ষেত্রে আমার বাবা মায়ের অন্তরেও সহানুভূতির লেশমাত্র ছিলনা। একবার ভুল করে দুপুরে ভাত খেতে বসে বাবাকে বলেছিলাম, “জানে তো ঐ ইনা মিনা ডিকা গানটা নাকি কিশোরকুমার নিজে গেয়েছে।” সাথে সাথে ওজনদার এক চড়ে মুখের ভাত ছিটকে পড়েছিল। কিশোর কুমারের নামটা জানা যে এত বড় গর্হিত অপরাধ, আবার ডবল অপরাধ, সিনেমার গানের বুলি আওড়ানো – একথা ধারণায় থাকলে কক্ষণও ভুল হতনা। তবে যে দিনের কথা বলছি, সেদিন মন ফুরফুরে – কোন ভয় ডর নেই, কারণ শাস্তি তো পেয়েছি অনেক দিন আগে স্কুলের ছাত্রী হিসাবে। এখন আমি কলেজে উঠব আজ বন্ধুদের সাথে সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্য বাবা মত দিয়েছেন। যে সিনেমা দেখব তা আবার প্রথম রঙীন ছবি। সৌন্দর্যর রাণী মানে beauty queen সায়ারা বানু তার নায়িকা। দুঃখ একটাই – এমন দিনে পরীক্ষার হল-এ বসে জ্যামিতির অঙ্ক কষতে হবে! হবেই অবশ্য, উপায় নেই, তাই দাদুর তত্ত্বাবধানে দুলে দুলে সব কটা theorem মুখস্থ করে ফেলেছি। পরীক্ষা কিরকম দিয়েছিলাম মনে নেই। পাশ করেছিলাম নিশ্চয়, কিন্তু সেটা দাদুর অবিচল ধৈর্য্যে আমার পিছনে খাড়া থাকার দরুণ। যা হোক করে উত্তর পত্র জমা দিয়ে, বাড়ী এসে দাদুর কাছে আরেকবার সব উত্তর মিলিয়ে নিতে হল। তার পর চল পানসি বেলঘরিয়া – রঙ্গীন হিন্দি ছবি আর সায়ারা বানু অপেক্ষা করে আছে!

অধীর চিন্তে বেরুবার জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু হায় অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। পুজো সেরে নীচে নেমে ঠাম্মা আমার সাজগোজ করে বের হওয়ার তোড়জোড় দেখে সন্দিগ্ধ গলায় শুধোলেন, “কই যাইতাছস?” না ভেবে চিন্তে উত্তর দিলাম, “জংলী দেখতে।” “সেইটা আবার কি?” “সিনেমা। সব বন্ধুরা মিলে যাচ্ছি।” দু-এক মূহূর্তের স্তম্ভিত নৈঃশব্দের পর পিতামহী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিভাবকত্বের কর্তব্য বিচ্যুতি শুধরে নিতে রওনা দিলেন। আমি তখনও বুঝিনি যে হরিষে বিষাদ ঘটতে আর মূহূর্ত কয় বাকী। ব্যস্ত হয়ে বিনুনীর ডগায় ফিতের ফুল বেঁধে রওনা দিয়েছি, মা এসে ঘোষণা করলেন, “ঠাম্মা বলেছেন তোমার যাওয়া হবে না।” আকাশ ভেঙে বাজ পড়লেও এত আশ্চর্য হতাম না। “সে কি?” ইতিমধ্যে অকুস্থলে ঠাকুমার সগৌরবে আবির্ভাব, “পরীক্ষা শেষ হইছে। সেলাই ফোঁড়াই ঘরের কাজ শিখবা তা না দল বাইক্ষ্যা জংলী দেখতে চললা!” হয়ে গেল রাণী ভিক্টোরিয়ার হুকুমে আমার স্বপ্নের মূলে কুঠারাঘাত। সিনেমায় যাওয়ার জিদে কান্না কাটি করলাম অনেকক্ষণ। তাতে আরো প্রমাণিত হয়ে গেল যে আমার বখে যেতে আর কয়েক চুলের দেরী। হিন্দি সিনেমা বস্তুটি তখনকার মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে সেদিন এমনি চরিত্র হননের আধার বলে বিবেচিত হত।

তার পর কতদিন গেল। পরবর্তী কালে সেই গর্হিত কাজটি অসংখ্যবার করা হল, কারণ তখন আমার পাখনা গজানোর দিন, কিন্তু হিন্দি বা বলিউড সিনেমা দেখতে গিয়ে মনের মধ্যে একটা কিন্তু কিন্তু বোধ করার সংস্কার গাঁথে থেকেছে

বরাবর । দেখতে ভাল লাগে সেটা একটু লজ্জার – ব্যাপারটা যেন সস্তা বা খেলো । সুপ্রচুর গান, তাক ধিনাধিন নাচ এবং অবাস্তব গল্প সব মিলিয়ে একটা মনমোহক আকর্ষণ থাকাটা যেন খেলোমিরই পরিচয় । সে জায়গায় রগরগে হলিউড সিনেমা দেখা বা সেটা নিয়ে আলোচনা করলে বরং বুদ্ধিজীবী বলে অহংকার করা যেতে পারে । পিতামহী তাঁর সংস্কারের ভিত্তি বিদ্রোহিনী পৌত্রীর মনের মধ্যে ভাল ভাবে গেঁথে দিতে পেরেছেন । তাঁর মানদণ্ড দিয়েই আমি নিজেও জগৎ কে মেপে চলেছি ।

পরিশিষ্ট –

হালফিল কিস্তি খেয়াল হতে আরম্ভ করেছে ঐবলিউডেই আমাদের ভারতবর্ষকে জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এবং সে পরিচয়টা গৌরবের । দর্শনের অধ্যাপিকা, ক্লাসে পাশ্চাত্য দর্শন পড়াচ্ছি, তারপর নিয়ম মারফিক প্রশ্ন করছি, কিছু জিজ্ঞাসা আছে কিনা । একটি হাত উঠল, “আচ্ছা, তোমাদের দেশের বেশীর ভাগ মেয়েই খুব সুন্দরী আর ভাল নাচে, তাই না ?” বলে কি ? এর সাথে যা পড়লাম তার সম্পর্ক কোথায় ? আর কথাটা যে আমাকে দেখে বলা হচ্ছে না, সে তো বোঝাই যাচ্ছে । গম্ভীর হয়ে বললাম, “কি বলতে চাও, খুলে বল” । প্রশ্ন কর্তী জামিয়ার মেয়ে । সে বলল, “আমাদের বাড়ীতে যখনই মেয়ে মহলের মজলিস বসে, আমরা বলিউডের সিনেমা দেখি । সর্ব্বাই কত সুন্দরী, কেমন নাচতে পারে !” আমি একটা বিষম খেয়ে ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম । বোঝা কান্ড, বলিউড ভারতের মহিলাকুলকে পৃথিবীর দরবারে পাইকারী হারে সুন্দরী করে ফেলল যে ! তা ভাল । সকলকে ভাল বললে ভালই তো ।

কয়েক দিন পরেই আরেক classroom এ গুছিয়ে বসে রেজিস্টার খুলেছি । গম্ভীর হয়ে নাম ডাকা শুরু করেছি, হঠাৎ মিহি গলায় প্রশ্ন ধেয়ে এল, “Mrs. Roy – আচ্ছা, তুমি বলিউড সিনেমা দেখ ?” বিরক্ত হয়ে বললাম, “নাম ডাকছি । জবাব দেবে তো” ? “ও হ্যাঁ হ্যাঁ, yes Mam, তবে বল না বলনা – বলিউড সিনেমা দেখ না ? কি মজা তোমাদের ! জান তো আমার পুরো পরিবার এখনও জর্ডানের রিফিউজি ক্যাম্পে রয়েছে । সমস্ত সময় নানান কষ্টের সাথে মোকাবিলা করে দিন যায় আমাদের । কত লোক যে depression এ ভোগে । নিত্যকার জিনিস পত্র নেই । যদিকে তাকাও কেবল – দুঃখ আর রাগ, ওই অসহায় রাগেই তো আমাদের ছেলেগুলো terrorism এর দিকে ঝুঁকছে । কিস্তি দিনের একটা সময় সর্ব্বাই সব দুঃখ ভুলে যায়, কারণ সেই সময়টায় টিভিতে বলিউড সিনেমা দেখানো হয় । আমার মা, মাসী, কাকীমা, পিসীমা যে যেখানে থাকে সব ঝগড়াঝাঁটি ভুলে দল বেঁধে টিভি ঘিরে বসে পড়ে । আর যখন নাচ শুরু হয়, তখন সর্ব্বাই মিলে হাত ধরাধরি করে নাচতে আরম্ভ করে । কি আনন্দ কি মজা যে হয় । তোমাদের দেশের সিনেমা তো এগুলি, তার মানে তোমরা সব সময় এমনি হাসি খুশী থাকতে পার । আমাদের কাছে তোমাদের দেশটা স্বপ্নের দেশ ।”

তার পর এক দিন staff lounge এ এসে বসেছি ক্লাসের ফাঁকে । পিছন থেকে ঘাড়ের ওপর হাত এসে পড়ল, “Hi Devi . Have you seen the Slumdog millionaire?” মনটা বিগড়ে গেল । সিনেমাটি সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে দেখার কোন উৎসাহ পাইনি । ভারতবর্ষে যেখানে সেখানে সাম্প্রতিক রকম ভিখারি গুলো বদমাইশ গিজ গিজ করছে – তেমনি এক গল্প । তা নিয়ে রাজ্যের আধিক্যতা ! সব ছেড়ে আমাকেই বা এ প্রশ্ন কেন রে বাপু? ভারতীয় বলেই কি আমাকে সে সিনেমা দেখতে হবে ? বিরক্তির সাথে সংক্ষেপে বললাম, “নাঃ!” “আরে সে কি? শিল্পীর দেখে এস । এমন চমৎকার মুভি ।” বক্তা শ্বেতাঙ্গ । আমার সাথে এই কলেজেই শিক্ষকতা করেন । পৃথিবীর নানা বিষয়ে বিশেষ করে চলচ্চিত্র জগত সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখেন । আমার অজ্ঞতা নিয়ে ব্যথিত হয়ে বারবার বল্লেন, “কি সুন্দর রঙে ভরা মুভি । তোমাদের দেশকে সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।” থামিয়ে দিয়ে বললাম, “তুমি আমাদের দেশকে কতটুকু জানো?” “তেমন কিছুই জানতাম না, এই movie তোমাদের দেশকে চিনি দিয়ে দিল । এই movie দেখেই তোমাদের দেশকে ভালবেসেছি ।”

আর উত্তর না দিয়ে নিশ্বাস ফেলে ঘুরে বসলাম । হায় পিতামহী – তুমি হিন্দি সিনেমার মাহাত্ম্য বোঝা নাই ।



দেবীপ্রিয়া রায় – লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে । পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী । কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন । গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন । সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা । শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য ।

মনীষা বসু

বিষ্ণুপ্রিয়াদি

বিষ্ণুপ্রিয়াদি ছিল আমার মেজদির বন্ধু। প্রথম যখন বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে দেখি তখন আমি স্কুলের উচ্চ ক্লাসে পড়ি। মেজদি সবে স্কুল ফাইনাল পাশ করে প্রি-ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছে। ওখানেই আলাপ বিষ্ণুপ্রিয়াদির সাথে। কলেজের পর বিষ্ণুপ্রিয়াদি মেজদির সাথে প্রায় আমাদের বাড়ি আসত। বিষ্ণুপ্রিয়াদি তখন একটা লেডিজ হোস্টেলে থেকে মেজদিদের কলেজ পড়ত। ওদের বাড়ি ছিল কলকাতার থেকে দূরে এক শহরতলীতে। চা-জলখাবার খেতে খেতে ওরা দুজনে প্রফেসরদের, কলেজের ছেলে মেয়েদের, বন্ধুদের প্রস্তুতি দিতে বলে কলেজ পালিয়ে সিনেমা যাওয়ার ইত্যাদি নানা রকম গল্প করত। মনের দুঃখে আমি হোম ওর্যাক করতে করতে ওদের গল্প শুনতাম আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতাম ঈস্ কেন যে ছোট এখনও, কবে যে কলেজে যাব। আমার কাছে কলেজ তখন ছিল একটা রঙিন স্বপ্নের জগৎ। মাঝে মাঝেই হিসেব করে দেখতাম আর কত দিন-মাস-বছর বাকি আছে কলেজে যাওয়ার।

ওদের সব কথাবার্তার মধ্যে ‘শানুদা’ বলে একটা ছেলের কথা অনেক সময় শুনতে পেতাম। লক্ষ্য করতাম শানুদার কথা বলতে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। খুব কৌতুহল হতো শানুদা কে জানার জন্য কিন্তু মেজদির ভয়ে সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না। কারণ জানতাম মেজদি যদি বুঝতে পারে আমি ওদের সব কথা শুনছি তাহলে আর আমার সামনে কোন কথা বলবেনা। ওরা তো জানত না যে মন দিয়ে হোম ওর্যাক করার ভান করে আমি আসলে ওদের গল্প শুনতাম। যাইহোক, পরে মেজদির কাছেই শুনেছিলাম বিষ্ণুপ্রিয়াদির ঠাকুরমা আর শানুদার ঠাকুরমা ছিলেন একই পাড়ার মেয়ে। ছোটবেলায় ওনারা ‘গোলাপ জল’-সই পাতিয়েছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদির ঠাকুরমার বিয়ে হয়েছিল কাছাকাছি অন্য এক শহরে। কিন্তু শানুদার ঠাকুরমার বিয়ে ওদের সেই পাড়াতেই হয়েছিল। তাই বিয়ের পরও দুই ঠাকুরমার ভালোই যোগাযোগ ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াদি আর শানুদার জন্মের পর ওঁরা ঠিক করেছিলেন বড় হলে ওদের বিয়ে দেবেন। মোটামুটি সবাই সেটা জানত। বিষ্ণুপ্রিয়াদি আর শানুদারও অজানা ছিল না কথাটা। শানুদা ছোট থেকেই বিষ্ণুপ্রিয়াদির উপর নানারকম জোর জবরদস্তি করত, এটা সেটা এনে দেওয়ার জন্য হুকুম করত আর বিষ্ণুপ্রিয়াদি সেটা বেশ খুশি মনেই নিত।

দুই বোন আর এক ভাইয়ের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়াদি ছিল বড়। ভাই হওয়ার সময় ওদের মা মারা যান। ওরা তিন ভাই-বোন ঠাকুরমার কাছে মানুষ। ওরা ঠাকুরমাকে খুব ভালোবাসত। ছোটবেলায় গরমের আর পূজোর ছুটিতে ওরা ঠাকুরমার সাথে ঠাকুরমার বাপের বাড়ি যেত। আর ওখানে গেলেই শানুদাদের বাড়িতে যেত। দু-দিদি আর এক দাদা ছিল শানুদার। ওরাও আসত ওদের বাড়িতে। সবাই মিলে খেলাধুলো, পুকুরে ঝাপাঝাপি, একসাথে খাওয়া দাওয়া সব মিলিয়ে খুব মজা করতো। অবশ্য সবার ছোট অত্যন্ত আদরের শানুদা ছিল ভীষণ জেদী আর রাগী। ওদের বাড়ির সবাই খুব ভালোবাসত বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে। বিশেষ করে শানুদার মা খুব ভালোবাসতেন বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে। তাই নিয়ে হিংসুটে শানুদা অনেক সময় ঝগড়া করতো, চুল টেনে দিত। কিন্তু শান্ত স্বভাবের বিষ্ণুপ্রিয়াদি কখনো কিছু বলতো না। একবার তো রেগে গিয়ে এমন ধাক্কা দিয়েছিল যে পড়ে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদির কপাল কেটে অনেক রক্ত পড়ে ছিল। স্টিচ ও দিতে হয়েছিল। কপালের সেই কাটা দাগটা বেশ বোঝা যেত। সেবার অবশ্য শানুদা ভয় পেয়ে অনেকবার ক্ষমা চেয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়াদির কাছে। এরপর শানুদা আর কোনদিন বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে আঘাত করেনি। বিষ্ণুপ্রিয়াদি শানুদার ধাক্কা দেওয়ার কথা কাউকে বলেনি। বলেছিল সিঁড়িতে পা স্লিপ করে পড়ে গেছে। মনে হয় ছোটবেলায় ওদের বেশ ভালোই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল।

আমাদের সঙ্গে যখন বিষ্ণুপ্রিয়াদির আলাপ তখন শানুদা কলকাতা মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র। বিষ্ণুপ্রিয়াদির কথা শুনে মনে হতো কলকাতা আসার পর শানুদার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের অভূত লাগত ওদের

সম্পর্কটা। কারণ এতদিনের চেনা, ছোটবেলার বন্ধু তাছাড়া ওদের বিয়ে হওয়ারও কথা। দুজনেই কলকাতায় থাকে কিন্তু কখনও ওদের দেখা করতে, ফোনে কথা বলতে বা একসাথে কোথাও যেতে শুনিনি। মেজদি বিষুপ্রিয়াদিকে অনেকবার বলেছে শানুদাকে ফোন করতে, শানুদার সাথে দেখা করতে। কিন্তু বিষুপ্রিয়াদি কিছুতেই রাজী হত না। শুধু বলতো, ‘নারে পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকে বিরক্ত করে কি হবে। সময় হলে ঠিক ও ফোন করবে’। আমাদের অবশ্য মনে হত যে শানুদা কোনদিনই বিষুপ্রিয়াদিকে ফোন করবে না।

অনেক সময় ছুটিতে বাড়ি গেলে ঠাকুরমাকে নিয়ে বিষুপ্রিয়াদি শানুদাদের বাড়ি যেত। দুই ঠাকুরমার-ই বেশ বয়েস হয়েছে। একা চলাফেরা করতে পারেন না। তাই দেখা হলে দুজনেই খুব খুশী হতেন। শানুদার মাও খুব খুশী হতেন বিষুপ্রিয়াদিকে দেখলে। আগের মতোই আদর যত্ন করতেন। শানুদাদের বাড়ি তখন একদম খালি। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। দাদা দিল্লীতে চাকরী করে। শানুদাও বেশীর ভাগ সময় বাড়ি থাকত না। আর বাড়ি থাকলেও বিষুপ্রিয়াদিকে দেখলে এড়িয়ে যেত ওর সাথে কথা বলতো না। ছোটবেলার খেলার জায়গায় ও নিজেই একা একা ঘুরে বেড়াত। মন খারাপ করে একা পুকুর পাড়ে বসে থাকত। আমরা খুব বিরক্ত হতাম বিষুপ্রিয়াদির ওপর। ভাবতাম এত বোকা কেন বিষুপ্রিয়াদি! অহংকারী শানুদা যে ওকে পছন্দ করে না সেটা কেন বুঝতে পারে না! এখন মনে হয় শানুদার অবজ্ঞা বিষুপ্রিয়াদি ঠিকই বুঝতো, মন খারাপও থাকত তার জন্য। তবু রুঢ় সত্যটা স্বীকার করার সাহস ওর ছিল না বা ইচ্ছে করেই করতে চাইত না। মনে প্রানে তখনও বিশ্বাস করতো একদিন ওদের বিয়ে হবেই। এখন বুঝতে পারি একটা মিথ্যের স্বর্গেও বাস করতো। মেজদি একবার বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ‘শানুদা তো তোর কাছে কখনো আসে না, দেখা হলে তোর সাথে কথাও বলে না। তা হলে তুই কেন ওদের বাড়ি যাস? তোর লজ্জা করে না? শানুদা ছাড়া কি পৃথিবীতে আর কোন ছেলে নেই?’ শুনে খুব করুণ মুখে আস্তে করে বিষুপ্রিয়াদি বলেছিল, ‘নারে তোরা ওকে ভুল বুঝেছিস। পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে তো তাই একদম সময় পায় না’। কথাটা অবশ্য একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি আমাদের তবু বিষুপ্রিয়াদি দুঃখ পাবে বলে মেজদি আর কখনও কিছু বলেনি। বুঝতে পারতাম বিষুপ্রিয়াদি সত্যিই খুব ভালোবাসে শানুদাকে। তবে আমরা জানতাম শানুদা কোনদিনই ওকে বিয়ে করবেনা। মনে আছে একবার শানুদাদের বাড়ি হতে ঘুরে আসার পর অনেক দিন বিষুপ্রিয়াদির মন খারাপ ছিল। সেবার শানুদা বিষুপ্রিয়াদিকে দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আরও থাকা পর্যন্ত ফিরে আসেনি। শানুদার মা ছেলের ব্যবহারে খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। বিষুপ্রিয়াদির চোখে জল দেখে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে খুব সুন্দর একটা শাড়ি দিয়েছিলেন। সেবার এত অপমানিত হয়েছিল যে এরপর আর ওদের বাড়ি যেত না বিষুপ্রিয়াদি।

তারপর মেজদিরা পি-ইউনিভারসিটি পাস করে বি.এ-তে ভর্তি হলো। মেজদি নিয়ে ছিল অস্কে অনার্স আর ইকনোমিক্স, আর বিষুপ্রিয়াদি নিয়েছিল স্পেশাল বেঙ্গলি আর পলিটিকাল সায়েন্স। বিষয় আলাদা হওয়াতে ওদের দেখাশোনা অনেক কমে গিয়েছিল। নিজের পড়াশোনা আর অনার্সের বন্ধুদের নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকত মেজদি। তাছাড়া মেজদির তখন সময় কোথায়! ছোড়দার বন্ধু তাপসদার সাথে ওর জোর প্রেম চলছিল সেই সময়। তবে বিষুপ্রিয়াদি একাই মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে চলে আসত। আমার আর মা’র সাথে গল্প করত। আমার মা ও খুব ভালোবাসতেন ওকে। অনেক সময় মাকে নিজের মনে বলতে শুনেছি, ‘মা মরা মেয়েটা কি কপাল করেই না এসেছে’! মা শানুদার কথা সবই জানতেন।

ইতিমধ্যে আমিও কলেজে ভর্তি হয়েছি। অনেক অনেক কল্পনার স্বর্গ কলেজে গিয়ে আমিও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিষুপ্রিয়াদির সাথে বেশি আর দেখা হত না। কোন কোন দিন অবশ্য বাড়ি ফিরে বিষুপ্রিয়াদিকে মা’র সাথে গল্প করতে দেখলে পাশে গিয়ে বসতাম। একদিন শুনেছিলাম মা ওকে বলছেন, ‘তোমার ঠাকুরমা এবার তোমার আর শানুর বিয়ের ব্যবস্থা করলেই পারেন’। শানুদা তখন ডাক্তারী পাশ করে গেছে। মায়ের আশঙ্কা ছিল ঠাকুরমা মারা গেলে শানুদা ওকে আর বিয়ে করবে না। স্নানমুখে সেদিন বিষুপ্রিয়াদি বলেছিল, ‘মাসিমা আমি তো দেখতে সুন্দর না তাই শানুদার আমাকে পছন্দ না। ও আমাকে বিয়ে করবে না বলেছে’। এই আশঙ্কা আমাদের অনেকদিন থেকেই ছিল তবু বিষুপ্রিয়াদির মুখে কথাটা শুনে খুব খারাপ লেগেছিল, কষ্ট হয়েছিল। ছোটখাট ময়লা রঙের বিষুপ্রিয়াদি ছিল খুবই সাধারণ দেখতে। সামনের

দাঁত ছিল একটু উচু। যদিও শানুদাকে দেখার সৌভাগ্য কোন দিন হয়নি, তবু বিষ্ণুপ্রিয়াদির মুখে শুনে জানতাম লম্বা চওড়া শানুদা ছিল খুব হ্যান্ডসাম। মা সেদিন আদর করে বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, ‘বাইরের দেখাটাই কি সব! তোমার এত সুন্দর মন, এতো ভালোবাসা শানু কি আর কোথাও পাবে? তোমাকে বিয়ে না করলে শানু সত্যিই ঠকবে’। মায়ের কোলে মাথা গুঁজে সেদিন খুব কেঁদেছিল বিষ্ণুপ্রিয়াদি।

যাই হোক দিন চলে যায়। বি. এ. ফাইনালের পর তাপসদার সাথে মেজদির বিয়ে হয়ে গেল। মেজদির বিয়েতে বৌভাত পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়াদি আমাদের বাড়িতে ছিল। বিয়ের দিনও কনে চন্দনে মেজদিকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের ক’দিন সমস্ত সময় হই চই করে তাপসদার পেছনে লেগে সারাবাড়ি এত মাতিয়ে রেখেছিল যে মনেই হচ্ছিলনা ওর মনে কোন দুঃখ আছে। বোধহয় নিজেকে ভোলাবার জন্যই অত হই চই করেছিল। তখন বিষ্ণুপ্রিয়াদি ওদের বাড়ির কাছে এক বাচ্চাদের স্কুলে পড়ত।

তারপর হঠাৎ করে আমারও বিয়ে হয়ে যায়। আমার ডাক্তার বরের এদেশ হতে পনের দিনের জন্য দেশে গিয়ে এক বিয়ে বাড়িতে আমাকে দেখে এত পছন্দ হয়েছিল যে সাত দিনের মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেল। তখন আমি সবে বি. এ. পাশ করে এম. এ. তে ভর্তি হবার জন্য খোঁজ খবর করছি। যাক সে তো অন্য গল্প। এই তাড়াহুড়োর বিয়েতে আমার অনেক বন্ধুই আসতে পারেনি। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদি ঠিক এসেছিল আর আমাকে সুন্দর করে সাজিয়েও দিয়েছিল। সেবার বিষ্ণুপ্রিয়াদি একটু গস্তীর আর চুপচাপ ছিল। মেজদির বিয়ের সময়কার সেই উজ্জলতা সেদিন দেখিনি। জানিনা চোখের ভুল কিনা কিন্তু চন্দন পরাবার সময় আমি যেন বিষ্ণুপ্রিয়াদির চোখে জল দেখেছিলাম। সেইসময় বিষ্ণুপ্রিয়াদি আবার কলকাতায় আগের সেই লেডিজ হোস্টেলে থেকে বি. এড. পড়ত। আর সকালে হোস্টেলের কাছেই একটা বাচ্চাদের স্কুলে পড়ত।

বিয়ের দু-মাসের মধ্যে আমি চলে এসেছিলাম এদেশে। নতুন বর, নতুন দেশ আর নতুন সংসার নিয়ে দিশেহারা আমি আর কারও খবর নেওয়ার সময় পেতাম না। বলতে গেলে শুধু নিয়মিত মা’র আর মাঝেমাঝে দাদা-দিদিদের চিঠির মাধ্যমেই দেশের সাথে যোগাযোগ ছিল। ওটা তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ ছিল না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ফোনে লাইন পেলেও কথা ভালো করে শোনা যেত না। আর ফোন কল খুব এক্সপেনসিভও ছিল। চিঠি লেখাও হয়ে উঠত না তাই বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ ক্রমশ কমে আসছিল। যাইহোক, এদেশে চলে আসার বছর পাঁচেক পর একবার মা’র চিঠিতে জেনেছিলাম শানুদা ওর ঠাকুরমা মারা যাওয়ার পর এক সহপাঠনিকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে এসেছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদির ঠাকুরমা অনেক চেষ্টা করেও বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে বিয়েতে রাজি করাতে পারেননি। ওর বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদি বি. এড. পাশ করে বাড়িতে ফিরে গেছে। ওখানেই এক স্কুলে পড়ায়। যদিও জানতাম শানুদা ওকে বিয়ে করবেনা তবু শুনে খুব মন খারাপ হয়েছিল। অনেক বার ভেবেছি পরেরবার যখন দেশে যাব তখন বিষ্ণুপ্রিয়াদির সাথে দেখা করব। কিন্তু দু-তিন বছর পর পর অনেক কষ্টে চাকরী থেকে টেনে-টুনে যখন মাস খানেকের ছুটিতে দেশে যেতাম তখন আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেই সময় ফুরিয়ে যেত। বিষ্ণুপ্রিয়াদির বাড়ি আর যাওয়া হতো না।

তবে বছর দশেক আগে একবার দেশে গিয়ে মেজদির সাথে বিষ্ণুপ্রিয়াদির বাড়ি গিয়েছিলাম। সেদিন বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে দেখে ভীষন মন খারাপ হয়েছিল। তখন কতই বা বয়েস বিষ্ণুপ্রিয়াদির কিন্তু প্রায় সব চুল সাদা হয়ে গেছে। সরু পাড়ের সাদা শাড়ি পরা বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে দেখাচ্ছিল এক তপস্বিনীর মতো। মনে হচ্ছিল এই বস্তুতাত্ত্বিক যুগের ছোটখাট চাওয়া-পাওয়া আর ওকে স্পর্শ করেনা। সংসারে থেকেও যেন সংসারে নেই। সব কিছুর উর্দে। ওর বাবা আর ঠাকুরমা দুজনেই তখন মারা গেছেন। বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে ছোট ভাই দোতলায় থাকে। একতলায় থাকে ছোটবোন। বিষ্ণুপ্রিয়াদি ছাদের একটা ছোট ঘরে থাকে। পাশেই রান্নাঘর আর বাথরুম। ভাই-বোনেরা ওদের সাথে থাকতে বলে কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদির একা থাকতেই ভালো লাগে। আমাদের দেখে খুব খুশী হয়েছিল সেদিন বিষ্ণুপ্রিয়াদি। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও নিজের হাতে লুচি তরকারি বানিয়ে আমাদের খাইয়ে ছিল। অতদিন পরেও বিষ্ণুপ্রিয়াদির মনে ছিল ছোটবেলায় আমি লুচি তরকারি খেতে খুব ভালোবাসতাম।

সেদিন অনেক গল্প করেছিল বিষ্ণুপ্রিয়াদি। বলেছিল, ‘জানিস বেশ আছি আমি। কোন বন্ধন নেই, একদম স্বাধীন। যখন যা ইচ্ছে করতে পারি, যেখানে খুশী যেতে পারি। কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না’। সেই কলেজের দিনগুলোর মতো মেজদি আর বিষ্ণুপ্রিয়াদি নানা রকম গল্প করছিল। আর ওদের গল্প শুনতে শুনতে টেবিলের উপর রাখা সুন্দর একটা ছেলের ছবির দিকে তাকিয়ে কিছু প্রশ্ন আমার মনে ভির করেছিল – “এই কি সেই শানুদা? এখনও কী বিষ্ণুপ্রিয়াদি শানুদাকে ভুলতে পারেনি? এখনও শানুদাকে ভালোবাসে? এত ভালোবাসা কি সত্যিই সম্ভব”? সেটাই ছিল আমার শেষ যোগাযোগ বিষ্ণুপ্রিয়াদি সাথে।



মনীষা বসু — জন্ম কলকাতায়। সত্তর দশকে বিয়ের পর থেকে শিকাগোবাসী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। Purdue University থেকে কম্পিউটার সাইন্সে বি এস ডিগ্রি। পেশায় আই. টি.। ছোটবেলার থেকেই লেখালেখির অভ্যাস। আমেরিকার বিভিন্ন বাংলা পত্র পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয় অবসর — বই পড়া, গান শোনা, লেখা আর বাগান করা।

“আজ বিকেলের আহির ভৈরবে
আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।
ঠিক যেভাবে
ভালোবাসবার পরে
খুঁজি আশ্রয়!”

— মৌসুমী ব্যানার্জী
একলাঘর

পিনাকী মন্ডল

কালো ছত্রাক

সবসময়ই নিতাইকে বলা থাকে সিট রাখতে। বিকাশবাবুর সাতটার আগে হাওড়া ঢোকা হয় না প্রায় কোনদিনই, নিতাই রানিং-এ ট্রেনে উঠে গায়ের জোরে, গলার জোরে সিট দখল করে রাখে। দুজনেরই বয়স মধ্য চল্লিশ হলেও নিতাইয়ের চেহারা দড়ি পাকানো আর বিকাশবাবু গড়পড়তা বাঙালির মত ঢলঢলে। ট্রেন ছাড়লে নিতাই আলুর চপ দিয়ে আচার মাখানো মুড়ি খেয়ে শরবতের মত মিষ্টি দুধ-চা খায়। বিকাশবাবু বাড়ী থেকে আনা শসা কেটে মুড়িটা খেয়ে নেন। এখন আর আগের মত খাবার দাবারে অত অত্যাচার নয় না। তারপর তাস খেলা দেখতে দেখতে ক্ষীরাই স্টেশনে এসে স্কুটি চালিয়ে বাড়ি। আজ তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত হাঁকপাঁক করে দৌড়ে এসে বিকাশবাবু দেখলেন ট্রেনের আলোটা ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে। অনেকদিন পর আজ ট্রেনটা মিস হয়ে গেল।

শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা দশের হাওড়া স্টেশন, টগবগে ভিড়, কোথাও একদন্ড স্থির হয়ে দাঁড়ানো যায় না। পরের ট্রেন প্রায় দেড়ঘন্টা পরে। বিকাশবাবু একটা জায়গা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলেন যেখানে এই সময়টা একটু চুপচাপ বসে টিফিন খেয়ে খবরের কাগজটা আবার একবার পড়ে ফেলা যাবে। হাওড়া স্টেশনে বসে সময় কাটানোর প্রয়োজন তাঁর কোনদিনই হয় নি। সকাল বিকাল হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বরং তাঁর মনে হয় স্টেশনটা এত বড় কেন! আজ দেখলেন, স্টেশনটায় অনেক কিছু আছে। ফুডকোর্ট আছে জানতেন, তার ভিতরে যে এত রকম খাবার দাবার আছে সেটা জানতেন না। কিন্তু স্টেশনের মত ফুডকোর্টও গমগম করছে ভিড়ে। শান্তিতে বসা যাবে না। স্টেশনের বড় হলটাতে বার দুয়েক টহল মারলেন, একটা বসার জায়গা পেলেন না। হঠাৎ মনে পড়ল ঝগড়াঝাঁটি করে উলুবেড়িয়ার চলে যাবার আগে পর্যন্ত এই ট্রেনটায় রোজ ফিরত বিকাশবাবুর ভাই প্রকাশ। ট্রেনটা ছাড়ে হাওড়ার নতুন কমপ্লেক্স থেকে, সম্ভবতঃ একদম শেষ প্ল্যাটফর্ম বাইশ নম্বর থেকে।

বিকাশবাবু পা চালালেন। এবড়ো স্টেশনের একদম শেষ প্ল্যাটফর্মের কাছে গিয়েও কি আর একটাও বেঞ্চ খালি পাবেন না। কিন্তু চমৎকার! পুরোনো থেকে নতুন কমপ্লেক্সে যাবার স্বচালিত সিঁড়িটি বন্ধ। পাশের হেঁটে ওঠার সিঁড়িটির সামনেও আরপিএফ দাঁড়িয়ে আছে, উঠতে দিচ্ছে না, ওভারব্রিজে কাজ হচ্ছে। সিঁড়ির পাশ দিয়ে নতুন কমপ্লেক্সে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে, মালপত্র বোঝাই আর খালাস করার জায়গা দিয়ে রাস্তাটা। বিকাশবাবুর সামনে কয়েকটা লোক এই ব্যবস্থায় ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে রাস্তাটা দিয়ে হাঁটা লাগাল। এটাই যখন উপায়, কিছু করার নেই – বিকাশবাবুও এগোলেন। জায়গাটা আলো আঁধারি। কুলিরা মালপত্র টানার কাঠের তক্তায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, কেউ কেউ গোল হয়ে বসে তাস খেলছে। বিকাশবাবুর সামনেই একটা বড় মাল নিয়ে যাবার ট্রলি হঠাৎ আটকে গেল, একটা চাকা ঘুরছে না, বঁকে গেছে। চারদিক থেকে অনেক কুলিরা ছুটে এল, ট্রলিটা উল্টে না যায়। বিকাশবাবু দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। একজন কুলি তাকে বলল বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে চলে যেতে, নতুন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যাবেন। বিকাশবাবুর বিরক্তি চরমে উঠে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছু করার নেই। গজগজ করতে করতে নতুন রাস্তায় পা চালালেন। কিছুটা গিয়েই রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরে গেছে, তারপর একটু পরেই বাঁদিকে, আবার ডানদিকে – এরকম করে কিছুক্ষণ পর রাস্তাটা শেষই হয়ে গেল। সামনে দেওয়াল। বিকাশবাবু কিছুক্ষণ বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর রাগে মনে হল তাঁর মাথা ফেটে ফুটিফাটা হয়ে যাবে। দুমদুম করে পিছনের দিকে চলতে শুরু করলেন। কিন্তু রাস্তাটায় একটা বাঁক নিয়েই বিকাশবাবু থমকে গেলেন। আসবার সময় রাস্তাটা ক্রমাগত বাঁকাচোরা ছিল, আর এটা একটা নাক বরাবর সোজা রাস্তা। কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল বাড়ী। রাস্তাটার দুপাশে হঠাৎ করে নানা দোকান দেখা যাচ্ছে – মুদির, ইলেক্ট্রিকের, মিষ্টির। আলো জ্বলছে কিন্তু কোন লোকজন নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা কি হল ! হাওড়া স্টেশনের মাইকের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এসব কি ! সারদাময়ী মিষ্টান্ন ভান্ডার, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া – ফ্রেডস বুকস স্টল, চক্রবর্তী নার্সিং হোম – আর সামনে ওই বড় বাড়িটা কিসের । বিকাশবাবু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, মাথায় হাত দিলেন, ঘড়ি দেখলেন – কোথাও কোন গন্ডগোল দেখতে পেলেন না । তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ করে । পকেট থেকে ফোনটা বের করলেন, শনিবার, সাতটা পঁচিশ, জিও ফোর জি । বাড়িতে একটা ফোন লাগালেন । ফোন লেগে গেল, বাচ্চা মেয়েটা ফোন ধরল, তার মাও কথা বলল । তারপর ফোনটা রেখে এই অবাস্তব পরিস্থিতিতে বিকাশ সেন দাঁড়িয়ে রইলেন ।

মাইকের শব্দ শোনা যাচ্ছে, পাঁশকুড়া লোকাল সাতের নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে । বিকাশবাবু কি করবেন কিছু ঠিক করতে না পেরে, সারদাময়ী মিষ্টান্ন ভান্ডারের সামনে একটা কাঠের বেঞ্চে বসলেন । এবং পড়ে গেলেন । বিকাশবাবু মাটিতে আর বেঞ্চটা বিকাশবাবুর মাথার মাঝবরাবর মাথা ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে । এবং হঠাৎ করে বিকাশবাবুর অনেক কিছু মনে পড়ে গেল । রাজগ্রাম, বাঁকুড়া । বিকাশবাবুর বাবাদের বাড়ি ছিল, খুব ছোটবেলায় বিকাশবাবু একবারই গেছিলেন । এটা রাজগ্রাম বাজার মোড়, বাবা সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে এখানে নিয়ে এসে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলেন । বিকাশবাবু একটা সাইকেল-এ বসেছিলেন, বাবা সামনে দাঁড়িয়ে চা-এর ভাঁড় নিয়ে গল্প করছিলেন । বিকাশবাবুর নড়াচড়া বা অন্য কোন কারনেই হোক, সাইকেলটা পড়ে যায় । সবাই হৈহৈ করে ছুটে আসে । বাবার গলা শুনতে পান বিকাশবাবু । আরো অনেক লোকের গলাও । তারা বাবাকে বকাবকি করছে বাচ্চাকে সাইকেলে বসিয়ে রেখে দেওয়ার জন্য ।

এসব সরে গিয়ে, সামনে হাওড়া স্টেশনের মালপত্র রাখার জায়গাটা ফুটে ওঠে আবার । বিকাশবাবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান । হেঁটে যাওয়া রাস্তাটার উপর বসে ছিলেন তিনি । রাস্তাটা ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলেন, একটু এগোতেই দেখলেন, একদল লোক রাস্তাটার একটা অন্য বাঁক ধরে হস্তদন্ত হয়ে চলে যাচ্ছে । সেই বাঁকটার মুখে একটা ছোট পিচবোর্ডের উপর লেখা হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স এবং একটা তীর চিহ্ন দিয়ে দিকনির্দেশ । বিকাশবাবু এই লেখাটা দেখেননি, রাগের মাথায় হনহন করে ভুল দিকে চলে গেছিলেন । এখন সেই ভুল রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে দেখেন এককোনে একটা আন্ডার রিনোভেশন লেখা ত্রিকোণ লেবেল পড়ে আছে । অনেক লোক ক্রমাগত আসছিল এই রাস্তাটা ধরে, বিকাশবাবু তাদের সঙ্গে চলতে চলতে নিউ কমপ্লেক্সে পৌঁছে গেলেন ।

নিউ কমপ্লেক্সে পৌঁছে, মুখে হাতে জল দিয়ে, একটা জায়গায় বসে বিকাশবাবু ভাবতে লাগলেন তাঁর ঠিক কি হল । ভাবনা চলল ট্রেনেও, বিকাশবাবু শেষের দিকে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলেন, প্রবল জলতেষ্ঠা পেতে লাগল । রাত দশটায় ক্ষীরাই স্টেশনে নেমে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে হল সর্বশক্তি দিয়ে গাড়িটা চালাতে হচ্ছে । কোনক্রমে বাড়ি পৌঁছে, চান করে শুয়ে পড়লেন । স্ত্রীকে বললেন, ক্লান্তিতে আর গরমে ভালো লাগছে না, এখন আর কিছু খাবেন না ।

ভালো ব্যাপারটা হল, কাল রবিবার । সকালে মেয়েকে নাচের আঁকার স্কুলে দিয়ে বাজার আর টুকিটাকি কিছু কাজ করে আবার মেয়েকে নিয়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে কিছুটা আরাম করা যাবে । কবিতাকে কি কিছু বলা উচিত হবে ! এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেই মুশকিল । এমনিতেই কবিতার মাঝে মাঝে অকারণেই মন খারাপ হয় । সে মন খারাপ সাধারণ মন খারাপ নয়, একদম গুম হয়ে বসে থাকে, মেয়েকেও দেখে না । এরকম মানুষকে নতুন করে চাপ দেওয়ার মানে হয় না । হয়ত কালকে গরমে, বিরক্তিতে, দৌড়াদৌড়িতে বিকাশবাবু হঠাৎ একটু অজ্ঞানমত হয়ে গেছিলেন । বেহুঁশ হয়ে কিছুক্ষণ আবোলতাবোল দেখে আবার হুঁশ ফিরে এসেছিল । ওরকমটা যে কারোর হতে পারে । নিজেকে অনেক প্রবোধ দিলেও বিকাশবাবুর মন থেকে খচ্ছচানিটা গেল না । বাঁকুড়ায় বাবা যখন তাকে নিয়ে গেছিলেন তখন তিনি এতই ছোট যে কিছু মনে থাকার কথা নয়, মনে তাঁর কিছু ছিলোও না । এই যে সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়া, বাজারের দোকানের নাম, প্রতিটা জিনিস তাঁর মনে এল কি করে বিকাশবাবু এই কেরানির কাজে ঢোকার আগে কিছুটা পড়াশোনা করেছিলেন । বোতানি নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রীটা আছে । তাই এই ব্যাপারটাকে নেহাত ঘটে যায় ঘটনা না ভেবে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই

দিনের কথা মনে মনে বিশ্লেষণ করতে থাকলেন। এবং দেখলেন কোন ভাবেই তাঁর এই বাঁকুড়ার রাজখামের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। বাবা সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনাটা গল্প করে বলেছেন, রাজখামে তাঁদের বাড়ি ছিল, সেই গল্পও করেছেন। কিন্তু দোকানগুলো কেমন ভাবে পরপর ছিল, পরিবেশটা এসব তো গল্প থেকে পুরোটা বানিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তারপর বিকাশবাবু দেখতে পাচ্ছিলেন বাবাদের গল্প করতে – এরকম ভাবে কি মানুষ গল্প শুনে স্বপ্ন দেখে। নাকি বিকাশবাবুর শৈশবের স্মৃতি তাজা হয়ে গেছিল হঠাৎ করে।

এ ভাবনার কোন উত্তর নেই। বিকাশবাবু অপেক্ষা করতে থাকলেন আবার যদি এরকম হয়। কিন্তু তারপর একমাস চলে গেলেও ব্যাপারটা আর হল না। বিকাশবাবুর মাথা থেকেও ঘটনাটা আস্তে আস্তে ফিকে হতে থাকল। জুনের শেষাশেষি প্রবল বর্ষায় একদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে বিকাশবাবু একটু বিপদে পড়লেন, পাশের মজে যাওয়া ডোবাটা উপচে গেছে, তাঁদের বাড়ির সামনে জল এসে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি বের করতে কসরত করতে হবে, ইঞ্জিনে জল না ঢোকে। কোনবারে এরকম হয় না, এবারে হল। ডোবাটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, এ তো সবে জুন। লোকের সঙ্গে কথা বলা, ক্লাবে গিয়ে আলোচনা, সবাই হাত তুলে দিলে তাঁকে একায়েই করতে হলে সেটার খরচ কেমন, এখন এই ভরা বর্ষায় কতটা কি করা সম্ভব এসব ভাবতে ভাবতেই ট্রেনে উঠে পড়লেন বিকাশবাবু। আজ মেদিনীপুর লোকাল অবিশ্বাস্য ফাঁকা। তেড়ে বৃষ্টি হচ্ছে, শুক্রবার, লোকে মনে হয় আজকে সব ক্যাজুয়াল নিয়েছে। বাগনানের পরও ফাঁকা ট্রেন দেখে প্লাস্টিক থেকে বর্ষাতিটা বের করে বিকাশবাবু ট্রেনের এককোনে ফ্যানের তলায় একটু মেলে দিলেন। বর্ষাতির প্যাণ্টের পায়ের তলাটায় সবুজ মত কি লেগে আছে। ভালো করে দেখবেন বলে উঠতেই ব্যাপারটা আবার হল। একটা ঘরের ভিতরে বিকাশবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, পা টলমল করছে। ট্রেনের শব্দও আসছে, হতে পারে ট্রেনটা কাঁপছে বলে এরকম টলমল মনে হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ দৃশ্যটা বদলে গেল, সামনে একটা বড় স্টিলের জিনিস নড়ছে। ভালো করে দেখলেন বিকাশবাবু, এবং রোমাঞ্চিত হয়ে বুঝতে পারলেন, জিনিসটা একটা বড় দুধ খাওয়াবার বিনুক। একটা বড় হাত এসে তাঁকে ধরল, তারপর বিনুক থেকে এসে পড়ল অনেকখানি দুধ। একটা হেঁচ শোনা গেল – শুইয়ে দিন, শুইয়ে দিন – এরকম। আস্তে আস্তে বিনুক আর দুধের দৃশ্যটা চলে গিয়ে বিকাশবাবু দেখলেন গোটা চার পাঁচ লোক চারদিকে। একজন খবরের কাগজ দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করছে। এবারের ঘটনার পরে, বিকাশবাবু রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। রাস্তা পেরোতে গিয়ে এরকম হলে কি হবে বাসে উঠতে গিয়ে? একটা ভালো ডাক্তার দেখানোর ঠিক করলেন, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। কাজটা করতে হবে একদম চুপচাপ। সেদিন অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিটে গেছেন মেয়ের জন্য একটু সস্তায় পুরোনো বই কিনবেন বলে। নিরঞ্জন স্যারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বনমালী কলেজের বোটানির গেট লেকচারার ছিলেন। বালিচকে বাড়ি, বিকাশবাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে ট্রেনে দেখা হয়ে যায়। ট্রেনে ফিরতে ফিরতে নিরঞ্জনবাবু গল্প করছিলেন, তিনি সম্প্রতি জার্মানি গেছিলেন, বোটানির উপর একটা বড় কনফারেন্সে, সাইন্স কত এগিয়ে গেছে। এখন মানুষের চেতনা, বুদ্ধি এসবও নাকি সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে। একটা ছোট ছত্রাক কত কি করতে পারে ইত্যাদি। দোনামোনা করতে করতে বিকাশবাবু জানতে চাইলেন, কোন ছত্রাক কি মানুষের পুরোনো ভুলে যাওয়া স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারে।

বিকাশবাবু ট্রেন থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বাড়ি এলেন, এখন রাত। কবিতা টিভিতে ভানুমতির খেল দেখছে। জানালার ধরে বসে থাকতে থাকতে তাঁর খুব ইচ্ছে এখন ডোবাটার কাছে যাওয়ার। তাঁর মন বলছে ওই মজে যাওয়া ডোবা বা হাওড়ার মালগুদামে এককোনে জমে পড়ে থাকা জলে আছে কিছু একটা। যা তাঁর পায়ের সংস্পর্শে এলেই বাড়িয়ে দিচ্ছে তাঁর স্মৃতি রোমন্থনের ক্ষমতা। কারণ তাঁর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে আছে বহুদিন থেকে বসবাস করা একফালি কালো ছত্রাক। অনেক ওষুধ খেয়ে সেটার আয়তন কমলেও অল্প একটু আজও রয়ে গেছে।

পুষ্পা সাক্ষেনা (অনুবাদ – সুজয় দত্ত)

ঝড়

“এক্সকিউজ মি, আমি কি এখানে বসতে পারি?”

প্রশ্নটা কানে যেতে কফিভর্তি মগ থেকে মুখ তুলে জেনিফার দেখল এক ভারতীয় যুবক দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের পাশে। রেস্টোরাঁয় খদ্দেরের ভীড় এখন এতটাই যে জেনিফারের সামনের চেয়ারটা ছাড়া আর বসার জায়গা নেই।

“ওঃ শিওর”, আন্তরিকতাপূর্ণ উত্তর দেয় ও।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যুবকটি নিজের জ্যাকেট চেয়ারের পিছনে টাঙিয়ে আরাম করে বসে। জেনিফার সামনের ধুমায়িত কফিপটের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলল, “কফি খাবেন নাকি?”

“থ্যাংকস্ ! বাঁচালেন। ঐ ভীড় কাউন্টারে গিয়ে আর দাঁড়াতে হবে না। এরকম অতিথিপরায়াণতা বিদেশ-বিভূঁইয়ে ভারতীয় ছাড়া আর কার কাছেই বা আশা করা যায় বলুন? তা, আপনি ভারতের কোন্ শহর থেকে?” বলতে বলতে যুবকের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। চেহারায় বেশ একটা ভোলাভালা গুডবয়-গুডবয় ভাব থাকলেও কথাবার্তায় সে যে সপ্রতিভ, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

“আপনি আমার অতিথিও নন, আর আমি ভারত থেকে আসিওনি। আমি আমেরিকার নাগরিক, এখানেই জন্মেছি। কফি অফার করাটা একটা কার্টেসি – দ্যাট্‌স্ অল।” জেনিফারের উত্তরে চুপ মেরে যায় যুবকটি। খানিকক্ষণ পরে আমতা আমতা করে বলে,

“মাফ করবেন। কিন্তু আপনাকে দেখতে কেমন যেন ভারতীয়-ভারতীয়, আর তাছাড়া এতক্ষণ ধরে পরিষ্কার হিন্দীতে কথা বলছেন—”

“এতে অবাক হওয়ার তো কিছু নেই। আমার বাবা-মা ভারতীয়। আমি যেহেতু এখানে জন্মেছি, তাই নিজেকে আমেরিকান বলেই পরিচয় দিই। এখানে যারা জন্মায় তারা এদেশেরই নাগরিক – জানা আছে তো?”

“ও আচ্ছা। তাহলে আমি একেবারে ভুল বলিনি, বলুন? অন্ততঃ আপনার ধমনীতে ভারতীয় রক্ত তো বইছে। যাক, এবার আমার পরিচয়টা দিই। আমি সুধীর, আই আই টি কানপুর থেকে কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিং-এ পোস্ট্ গ্রাজুয়েট করতে না করতেই এখানকার একটা ভাল সফটওয়্যার কোম্পানীতে চাকরি পেয়ে গেলাম।” নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার খতিয়ান পেশ করতে করতে বেশ একটু গর্ববোধই করে ও।

“তাই নাকি? আজকাল তো শুনি আমেরিকা থেকে লোকে আই-টি সেক্টরের কাজ করতে ভারতে যায়। এনিওয়ে, আপনার সম্বন্ধে জেনে খুশী হলাম।”

“এবার আপনার সম্বন্ধে একটু জানতে পারি কি?”

“যদি অপরিচয়-টাই যথেষ্ট না হয়, তাহলে বলি, আমার নাম জেনিফার।” কফির মগ নাবিয়ে রেখে কব্জিতে জড়ানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে মেয়েটি।

“আপনি বোধহয় গ্লেনসিয়ার দেখতে যাওয়ার টুরবাসের সময় হল কিনা, দেখছেন। এখানে বেশীরভাগ লোক তো সেইজন্যই এসেছে। আমি অবশ্য ঠিক ভেবে পাচ্ছি না – আখাবাক্সা গ্লেনসিয়ারের টুর নেব, না এখানে বসেই দূর থেকে দেখে নেব তাকে। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় আপনি সত্যিই ঐ বরফমোড়া গ্লেনসিয়ারে যাবেন?”

“এ অভিজ্ঞতাটা না হলে এখানে আসার কী মানে ?”

“আপনি গেলে তো আমাকেও যেতে হয় । মেয়ে হয়ে আপনি যদি এই সাহস দেখাতে পারেন, আমার কি পিছিয়ে যাওয়া শোভা পায় ?”

“এক্সকিউজ মি ! এটা আমেরিকা । এখানে মেয়েরা কোনো ব্যাপারে ছেলেদের থেকে পিছিয়ে নেই ।”

“সরি, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি, মানে —”, কথাবার্তায় ওস্তাদ সুধীরের কথা আটকে যায় এবার ।

“আচ্ছা, বাসের সময় হয়ে গেছে, আমি চললাম ।” বলে উঠে দাঁড়ায় জেনিফার ।

“ওকে, চলুন আমিও যাই, নাহলে বাস মিস্ করব” বলে জেনিফারের আগেই টিকিটের লাইনে দাঁড়াবার জন্য তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে চেয়ারে টাঙানো জ্যাকেটের কথা বেমানুম ভুলে যায় সুধীর । কাউন্টার থেকে দুটো টিকিট কিনে একটা জেনিফারের দিকে বাড়িয়ে ধরে, “নি, আপনারটা আমি কাটলাম ।”

“থ্যাংক্‌স্ । যদিও সেটা করার দরকার ছিলনা ।” মানিব্যাগ খুলে পয়সা বার করতে করতে বলে মেয়েটি ।

“আরে থাক না, কী হয়েছে তাতে ? আমি পেমেন্ট করে দিয়েছি । আমাদের ভারতে কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সঙ্গে কোথাও গেলে অলিখিত নিয়ম হচ্ছে সেই ভদ্রলোকই সব পয়সাকড়ি দেবেন —”

“সরি, এটা আপনার ভারত নয় । অজানা অচেনা কারো কাছ থেকে এভাবে সৌজন্য নেওয়া আমার পছন্দ নয়”, জেনিফার সুধীরের হাতে কতকটা জোর করেই পয়সা গুঁজে দিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে ।

রেস্তোরাঁটা একটা উঁচু টিভির ওপর । অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে দুজনে বাসের কাছে পৌঁছল । আরও অনেক পর্যটক সেখানে আগে থেকেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল । গ্লেসিয়ারের বরফের ওপর চলাফেরা করা এইসব বাসের চেহারা বেশ একটু ভারী । চাকায় বিশেষ টায়ার পরানো । ওদের সামনে যতদূর চোখ যায় বরফের পুরু, সাদা চাদর — নাম আখাবাস্কা গ্লেসিয়ার । জেনিফার একসময় বলল,

“এটা জানো কি যে আখাবাস্কা গ্লেসিয়ারের বরফের সাপ্লাই আসে কলম্বিয়া আইসফীল্ড থেকে ? ওখানে প্রতি বছর প্রায় তেইশ ফিট বরফ পড়ে । বরফের গভীরতা দুশো সত্তর ফিট থেকে এক হাজার ফিট অবধি । এই গ্লেসিয়ার ছয় কিলোমিটার লম্বা । দেখলে বোঝাই যায়না যে এটা খুব আস্তে আস্তে নীচের দিকে বাহিত হচ্ছে ।”

আমেরিকায় বেড়ে ওঠা দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয় তরুণ-তরুণীদের আদতই হচ্ছে তারা ‘আপনি’ বৈশীক্ণ ধরে রাখতে পারে না । ইংরেজীতে তো আর আপনি-তুমির ভেদ নেই । সুধীর এই সুযোগটা লুফে নিয়ে বলে, “বাঃ, তুমি তো দেখছি এটাকে নিয়ে রীতিমতো রিসার্চ করে এসেছ !”

“আমি যেখানেই বেড়াতে যাই সে-জায়গা সম্বন্ধে ভাল করে জেনে শুনে আসা আমার অভ্যাস ।”

“গুড । চল, বাসে উঠে বসি । বাইরে তো হাত-পা জমে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ।”

“বাই দ্য ওয়ে, তোমার জ্যাকেট কোথায় ?” সুধীরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে জেনিফার ।

“ওঃ গড ! সে তো আমি রেস্তোরাঁতেই ফেলে এসেছি ! এখন আনতে গেলে এই বাস যে মিস্ হয়ে যাবে —”

“যাকগে, ছাড়ো ওসব কথা । এসব ছোট ছোট ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হলে চলেনা । এটাই আজকের শেষ বাস, তোমার জন্য তো আর অপেক্ষা করবে না । চাইলে কাল সকালের বাস নিয়ে নিতে পারো ।”

“না না, কাল অবধি অপেক্ষা করাটা মুশকিল । আমি যেমন বে-খেয়াল লোক, তারই শাস্তি পাচ্ছি । চলো, জ্যাকেট ছাড়া গ্লেসিয়ার দেখাটাও একটা অভিজ্ঞতা । পরে ফিরে এসে রেস্তোরাঁয় ওটা পাব তো ?”

“কোনো সৎ, দায়িত্বশীল লোকের হাতে পড়লে সে নিশ্চয়ই রেখে দেবে রেস্টোরাঁর মালিকের কাছে। সেরকম না হলে ঐ জ্যাকেটের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। অবশ্য এমনিতে আমেরিকানরা সৎ আর দায়িত্বশীলই হয়। ভাগ্যিস তুমি ফুলহাতা সোয়েটার পরে আছ অন্ততঃ।”

বাসে হীটিং চালু ছিল, ফলে তাপমাত্রা বেশ আরামদায়কই ছিল। ছেড়ে ধিল বাস। পাশে বসা জেনিফারকে একসময় বলল সুধীর, “শুনেছি গ্লেসিয়ারে গিয়ে লোকে স্নো-বল ছোঁড়াছুঁড়ি করে খেলে, স্নো-ফল্ হলে খুব মজা করে। আমার তো এসব ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। টেক্সাসে আর স্নো কোথায়?”

“হ্যাঁ। আমার কাছে অবশ্য স্নো আদৌ কোনো নতুন ব্যাপার নয়। শিকাগোতে জন্মায় যারা তারা স্নো-এর মধ্যেই বড় হয়। আমার তাই স্নো-ফল ভালই লাগে।”

“ও, তুমি শিকাগোয় থাক?”

“থাকতাম। এখন নতুন চাকরি নিয়ে অন্য জায়গায় যাব।”

“কোথায়, কোন্ ফীল্ডে চাকরি নেবে?”

“এখন কিছুই ঠিক নেই।” সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চুপ করে যায় মেয়েটা।

বাস ড্রাইভার আথাবাস্কা গ্লেসিয়ার সম্বন্ধে এতক্ষণ অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল। জানলা দিয়ে নজরে আসছে, বরফের চাদরের ওপর কিছু কিছু জায়গায় নিশান পৌঁতা। ড্রাইভার জানাল, ঐসব জায়গায় পাতলা বরফের আস্তরণের তলায় গর্ত আছে। ভুলক্রমে একবার বাস ওতে গিয়ে পড়লে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। বরফের ওপর দিয়ে বাসযাত্রা সত্যিই এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যেদিকে দুচোখ যায় শুধু সাদা আর সাদা। গ্লেসিয়ারের ওপর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে বাস থেমে গেল। ওখানে আগেই থেমে থাকা বাসগুলো থেকে পর্যটকরা নেমে তুমুল হৈছল্লোড় আর খেলাধুলো করছে। হাঙ্কা তুষারপাত তাদের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। জেনিফারকে রীতিমতো উৎফুল্ল দেখাল — “ওয়াও, উই আর লাকি! গ্লেসিয়ারের ওপর নরম তুলোর মতো স্নো কী সুন্দর আস্তে আস্তে নেমে আসছে দেখ। ঐ ওদের সঙ্গে খেলতে খুব মজা লাগবে। এসো, এসো!”

“না বাবা, আমি বাসেই থাকছি। পায়ের তলায় বরফ, মাথার ওপরে বরফ — এতসব আমার সহ্য হবে না। সঙ্গে আবার জ্যাকেটও তো নেই।”

“কাম্ অন, বী এ স্পোর্ট! এই অভিজ্ঞতাটাই যদি এড়িয়ে যাবে, তাহলে আর এখানে এসে কী লাভ? নাও, আমি আমার জ্যাকেট তোমায় ধার দিচ্ছি।” বলতে বলতে গায়ের জ্যাকেট খুলে সুধীরের দিকে বাড়িয়ে দেয় ও।

“না না, ও আমার চাই না। বিনা-জ্যাকেটে তুমি এই ঠান্ডার মধ্যে থাকবে কী করে?”

“ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি বরফ উপভোগ করি। মাটিতে দিনের পর দিন জমে থাকা বরফের মধ্যে চলাফেরা করে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নাও, কাম্ অন।”

সুধীরকে ওর জ্যাকেটটা পরতে বাধ্য করে জেনিফার এক লাফে বাস থেকে নামল গ্লেসিয়ারের ওপর। গ্লেসিয়ারের শৈত্য আর জেনিফারের উষ্ণতা — দুয়ে মিলে শরীরে রোমাঞ্চ জাগাচ্ছিল সুধীরের। হঠাৎ জেনিফার একটা বরফের গোলা ছুঁড়ে মারল সুধীরের গায়ে। জবাবে সুধীরও পাল্টা মারল। এইভাবে খেলার মজাটা আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে শুরু করল ও। তুষারপাত ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে, কিন্তু পর্যটকদের সেদিকে কোনো ভ্রক্ষেপ নেই। গ্লেসিয়ারের ওপর যেসব জায়গায় পতাকা লাগিয়ে চিহ্নিত করা, সেগুলো সম্বন্ধে ট্যুর গাইড আরো একবার সাবধান করে দিল — “ঐসব জায়গায় লুপ-হোল্ আছে, দয়া করে ওখানে যাবেন না। গতবছর কিছু ট্যুরিস্ট এইরকমভাবেই বরফের গর্তে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন।”



সাবধানবাণী সত্ত্বেও কিছু দুঃসাহসী ট্যুরিস্ট ঐ পিচ্ছিল গর্তগুলোয় উকিঝুঁকি মারছিল। তুষারপাত এখন বেশ ভারী। তাকে আর পৈজা তুলোর মতো লাগছে না, মনে হচ্ছে ভিজে কাপড়ের টুকরো। প্রচন্ড ঠান্ডা হাওয়া আর সেই নিরবচ্ছিন্ন তুষারপাত সুধীরের মনে ভয়ের সঞ্চার করল। বাস ড্রাইভারের জোরালো গলা শোনা গেল এবার – “ভারী তুষারঝড় আসছে। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। সবাই এক্ষুণি বাসে উঠুন।”

সবাই ছুড়োছুড়ি করে কয়েক মিনিটের মধ্যে বাসে উঠে পড়ল। বন্ধু জানলার ওপারে দূরন্ত হাওয়ার শনশনানি আর তুষারের ঝাপটায় সন্ত্রস্ত ভাবটা কাটছিল না। ভিজিবিলিটি হঠাৎ এতো কমে গেছে যে বাস ড্রাইভারকেও চিন্তিত লাগছে। আসার সময় রাস্তায় বরফ-ঢাকা যে লুকোনো গর্তগুলো ছিল, সেগুলোর কথা ভেবে সুধীরের বুকে কাঁপন ধরছিল। এই আবহাওয়ায় একবার ঐ গর্তগুলোর কোনো একটায় পড়লেই বাস – ফেরা মাথায় উঠবে। ওর ভয়টা অনুভব করে জেনিফার সাহস দেওয়ার জন্য বলল, “আরে চিন্তা করো না। আমরা বহাল তবিয়ে পৌঁছে যাব। এসবে আমি ভয় পাই না।”

“ইউ আর সো কুল! আমি আবার একটুতেই ঘাবড়ে যাই – মানে আমার বন্ধুরা তাই বলে। থ্যাংক্‌ গড, তুমি আজ সঙ্গে আছ।”

জেনিফারের কথাই সত্যি হল। বাস ঠিকঠাক পৌঁছে গেল যেখান থেকে ছেড়েছিল সেখানে। যাত্রীরা হাততালি দিয়ে নিজেদের খুশী ব্যক্ত করল। খারাপ আবহাওয়ায় এরোপ্লেন ভালভাবে ল্যান্ড করার পর সবাই যেমন করে আরকি।

বাসস্টপ রাস্তার যেদিকে, তার উল্টোদিকে অনেকটা সিঁড়ি ভেঙে তবে রেস্টোরাঁয় পৌঁছতে হয়। কিন্তু উপায় নেই, ঐ তুষারঝড়ে ওটাই একমাত্র আশ্রয়। ঝড়ের ভয়ংকর ঝাপটার মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। কোনোরকমে লড়াই করে ওরা দুজনে রেস্টোরাঁর সংলগ্ন গিফট্‌ শপে যেই পৌঁছেছে, অমনি বিদ্যুৎ চলে গেল। তখনও যারা সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল, তাদের মধ্যে ছুড়োছুড়ি পড়ে গেল সেই প্রায়াক্ষকার পরিবেশে। টর্চের আর মোবাইল ফোনের আলো ঝিলমিলিয়ে উঠল চারিদিকে।

“এখন কী হবে? সেই জ্যাকেট এখন কোথায় আছে কে খুঁজবে?” সুধীরের ভীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

“ওঃ, এখনো সেই জ্যাকেটের কথা ভুলতে পারছ না? নাহয় অন্য কেউই পরে বাঁচল সেটা, কারো একটু উপকার করলে।” জেনিফারের গলায় পরিহাস।

“না না, শুধু জ্যাকেট তো নয়, আমি সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা ভাবছি। রাত কাটবে কোথায়?”

“এখানে গিফট্‌ শপ আর রেস্টোরাঁয় মানুষ কাজ করে তো রে বাবা! আমাদের ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেবেনা নিশ্চয়ই। এরই কোনো এক কোণায় রাত কাটিয়ে নিতে হবে। চলো একটা কোণ খুঁজে বসা যাক।”

জেনিফারের হাতে একটা ছোট পেন্সিল টর্চ ছিল। তারই আবছা আলোয় দুজনে দোকানের একদম পিছনদিকে এক কোণায় একটু ফাঁকা জায়গার সন্ধান পেল। রাত ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। বিদ্যুৎ নেই, তাই হীটিং বন্ধ। ঠান্ডা বেড়েই চলেছে। সুধীর জেনিফারের জ্যাকেট ফেরত দিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু শুধু একটা সোয়েটারে এই ঠান্ডা ওর আর সহ্য হচ্ছিল না, দাঁত কিড়মিড়িয়ে উঠছিল। শুনে আধোঘুমের মধ্যেই জেনিফার নিঃসংকোচে নিজের শরীর দিয়ে সুধীরকে জড়িয়ে ধরল। সেই শরীরের উষ্ণতায় যেন প্রাণশক্তি ফিরে পেল ও। হঠাৎ কী যেন একটা হয়ে গেল, সুধীরের দুই হাত ওর অজান্তেই চঞ্চল হয়ে উঠে সর্বশক্তি দিয়ে জেনিফারকে আকর্ষণ করে মুখটা টেনে আনল ওর মুখের কাছে, আর ও মেয়েটার ঠোঁটে বসিয়ে দিল এক চুম্বন। ধড়মড় করে উঠে বসল জেনিফার,

“ইউ রাস্ক্যাল! আমি মানবিকতার খাতিরে তোমাকে সাহায্য করতে গোলাম, আর এই তার প্রতিদান! নাও গো অ্যাগুয়ে ফ্রম হিয়ার – রাইট নাও!”

“স-সরি জেনিফার । অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গেছে । আ-আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি —” সুধীর ক্ষমাভিক্ষার স্বরে বলে উঠল ।

“সরি ? হুঁ ! ওসব আমার জানা আছে । ভেবেছ মেয়েটা আমেরিকায় মানুষ হয়েছে, সেক্সের ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপত্তি-টাপত্তি নেই । এটা জানিয়ে রাখি যে, যতই এখানে জন্মাই আর বড় হই, কয়েকটা ব্যাপারে আমি নিখাদ ভারতীয় — হ্যাঁ, সেই যে তোমার দেশ ভারত, যার বড়ই করছিলে সকালে — সেখানকার মতন । কেন জানো ? ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্যের শিক্ষা আমি পেয়েছি আমার মায়ের কাছে । মা-ই আমাকে শিখিয়েছে কেন বিয়ের আগে সেক্স থেকে দূরে থাকতে হয় । বোধহয় তোমার দেশ ভারতে এসব আর শেখানো হয়না আজকাল, তাই না ?”

“বিশ্বাস করো — বিশ্বাস করো জেনিফার, আমি তোমার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ । বিয়ের আগে সেক্স যে করা উচিত নয়, আমিও জানি । সেই অপরাধ থেকে তুমি আমায় বাঁচিয়েছ । আমার এই ক্ষণিকের ভুলের জন্য যে শাস্তি দিতে চাও, দাও । আমি যেকোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী ।” সুধীর সত্যিকারের অনুতপ্ত গলায় বলল ।

“তোমার মতো লোককে শাস্তি দেওয়া আমার কর্ম নয় । ঈশ্বরই করবেন সেটা । এখন প্লীজ্ বিদায় হও — তোমাকে আর এক মুহূর্তও সহ্য করা আমার নিজের কাছেই শাস্তি ।”

নিরুপায় সুধীর কিছুদূরে আরেকটা কোণায় এক চিলতে জায়গা খুঁজে নিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসল । ভয়ংকর ঠান্ডাটা আবার শরীরে কামড় বসাচ্ছে, আসাড়া করে দিচ্ছে । বাইরের দমকা হাওয়ার তোড় বারবার খিড়কী দরজার কাচের সার্সি ভেঙে ফেলার বার্থ চেষ্টা করছে । কখন যে একসময় সুধীর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল, ওর কিছুই মনে নেই ।

জ্ঞান ফিরে দেখল, এক হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে ।

“আমি — আমি এখানে কীকরে এলাম ?” পাশে দাঁড়ানো নার্সকে দুর্বল স্বরে জিজ্ঞেস করে ও ।

নার্স সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলল, “জেনিফার নামে কোনো মেয়েকে চেন ? সে একটা নোট লিখে রেখে গেছে তোমার জন্য । এই যে ।” বলে একটা কাগজ এগিয়ে দিল । সুধীর বিছানায় শুয়ে শুয়েই রুদ্ধশ্বাসে পড়তে থাকে —

“সরি, মা আমাকে এটাও শিখিয়েছে যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে কেউ কখনো কারো ক্ষতি চায়না । কাল রাগের মাথায় বলেছিলাম, ঈশ্বর তোমায় শাস্তি দেবেন । আজ সকালে যখন শোরগোল শুনে ঘুম ভাঙল যে গিফট শপে একজন ঠান্ডায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, দেখলাম সেটা তুমি । নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল । আশা করি তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ফিরে যাবে নিজের জায়গায় । আমি আমার জ্যাকেটটা রেখে গেলাম তোমার জন্য । একটা কথা সবসময় মনে রেখ — এমন ভুল কখনো করবে না যার জন্য সারাজীবন মনে মনে লজ্জা পেতে হয় । আমি তোমাকে ক্ষমা করলেও ঐ লজ্জাটাই তোমার দীর্ঘমেয়াদী শাস্তি হয়ে রইল, তাই না ? বিদায় — জেনিফার ।”

স্তব্ধ সুধীর সেই নোটের দিকে তাকিয়ে রইল । হায়, একটিবার — শুধু একটিবার যদি জেনিফার জানার সুযোগ পেত যে এই ভারতীয় যুবকটি সেইসব জঘন্য চরিত্রের যুবকদের একজন নয় যারা নির্দিধায় রাতদিন এমন অপরাধ করে বেড়ায় । কাল রাতে যা হয়েছিল, সে তো সেই তুষারঝঞ্ঝার ফলশ্রুতি — যা ওর বুকো ক্ষণিকের বাড় তুলেছিল । আর কি কোনোদিন জেনিফারের সামনাসামনি হবে না ও ? ঈশ্বর যদি ওর অনুতাপের আন্তরিকতা বুঝে থাকেন, তাহলে জেনিফারের সঙ্গে অন্ততঃ আর একবার দেখা ওর হবেই এ-জীবনে । সেই আশা আর বিশ্বাস নিয়েই ও বেঁচে থাকবে ।



সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে । কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে । সাহিত্য তাঁর মনের আরাম । গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে । তিনি “প্রবাসবন্ধু” ও “দুকুল” পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন ।

উপাসনা নন্দী

ব্রিজ

একটু ঝুঁকে পর্দাটা সরালো অর্ক। মাথা ভার। চোখ জ্বালা জ্বালা। হালকা আলো খাটের ফুলছাপ চাদরে। হলুদ, নীল আর সাদা ফুল। ছিমছাম। জংলি কাজ পছন্দ করেনা সুতপা। ওর সবেতেই রুচিবোধ। সুরুচি সংঘ একেবারে। অর্কের গা কটকট করে। সুতপার সাথে ঝগড়া হয়না। বেশিরভাগ স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যেমন চলে... তু তু ম্যায় ম্যায়! সুতপা ঠান্ডা। ভীষণ ঠান্ডা। অর্কের মনে হয়, ঠান্ডা মাথার খুনি। বরফ দৃষ্টি। অর্ক আনকালচার্ড। গাঁইয়া। ইশকুল মাস্টার। বাপ প্রাইমারি সেকশনের হেডমাস্টার ছিল। সৎ। আদর্শবাদী। ইশকুলের পর ছেলে খুঁজে বেড়াত। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাবে। অর্কও বাপের পথে নেমেছে। প্রফেশন পেয়েছে, প্যাশন গোল্লায়। সুতপাকে পাওয়াটাই মেইন ছিল। অর্ক মেদিনীপুরিয়া। বন্ধুরা টুম্পা বলতো। সুতপা সাউথ ক্যালকাটা। বাণীচক্রে গান শিখত। হাজার একটা ফলোয়ার। তাদের টপকে মৌচাকে ঢিল মেরেছিল অর্ক। হুল খেয়েওছে কিছু, মধুও জুটেছে...

উঠতে গিয়ে মাথাটা একটু চক্কর কাটলো যেন। পা টলমল। ঝিমঝিম। ভাগ্যিস, সুতপা নেই। কর্পোরেট অফিসের পিকনিকে গেছে। একটা গোটা দিন। না গেলেও তো পারতো, বিশেষ করে কদিন যা চলছে। আজকাল বারণ করেনা অর্ক। ঝগড়াঝাঁটি করার বা বাধা দেবার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। দিয়েও বিশেষ লাভ হয়না। টেবিলের ওপর ঢাকা দেয়া থালা। অনেকখানি বেলা হয়েছে তবে। রিতাদি রান্না করে চলেও গেল! এতবেলা অর্ক... কাল একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মনে হয়। স্ট্রেস আর নেয়া যাচ্ছে না... শেষ অর্ক গৌতমের কথাগুলো...

“লড়তে হয় অর্ক, লড়তে শেখ”... অথচ এত ভয়ানক!!

মাথা টিপটিপ করছে অর্কের। সুতপা বিশ্বাস করেনা তাকে। অর্ক অপদার্থ। জেদি। সুতপার যেন জেদ নেই। সুতপার দাবি দাওয়া নেই। আজকাল ওই গানটাই সত্যি মনে হয় অর্কের... “নিজেকে নিজের মত গুছিয়ে নিয়েছি...” গুছিয়ে ওঠা হল কই আর!

অর্ক ঠিক গুছিয়ে কিছুই বলতে পারেনা। বিশ্বাসঘাতক জিভ। শব্দের জাগলারি অর্কের দ্বারা হয়না। মিথ্যে কথা। লোকজনের হিপোক্রিসি দেখেছে অর্ক। মাঠে, স্কুলে, গৌতমের ওই অবস্থাতেও।

সুতপার ছাড়া নাইটিটা দেখলো অর্ক। হাতে নিয়ে নাক ডুবালো একবার। সুতপার গন্ধ। বিয়ের পর প্রথম প্রথম এই গন্ধটার জন্য... সুতপাকে নিয়ে প্রায় লোফালুফি করতো অর্ক। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল থেকে রাত। সস্তার ভাড়া বাড়ি। সুতপার কষ্ট হত। মুখে বলতেনা, হাসি ঝুলিয়ে রাখতো। রাতের রান্নাটুকুর দায়িত্ব নিয়েছিল অর্ক। দু ব্যাচ টিউশনির পর। স্কুলে মুচলেকা দিয়েও। জ্যামিতি, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি। গরম ভাত, মাখন, আলুভাজা। একদিন খানিকটা ফ্যান পড়ে গেছিল পায়ে। হাউহাউ করে কেঁদেছিল সুতপা। ভাত রান্না বন্ধ সেদিন থেকে। সুতপা করে নিত। সময় না হলে বিপিনের দোকানের তড়কা রুটি। লংকা খেয়ে হুসহুস করতো ঝালে। ফর্সা মুখ লাল হয়ে যেত একদম। ঠোঁট টেনে চুমু খেয়েছিল অর্ক...

“আমাদের কি হবে অর্কদা”?? গৌতমের বউ। টেনে চুল বাঁধা। জুলজুলে টিপ। তখনও। ওঘরে গৌতমের বাবা। চারদিন আগে ছানি কাটিয়ে এনেছে গৌতম। অর্কের দুর্বল লাগছিল। অর্ক জানেনা উত্তর। চৌবাচ্চার জল বেরোনো ঢোকার অঙ্ক সহজ। অর্ক পারে দিব্য। এটার উত্তর জানেনা। গৌতমের পাঁচবছরের ছেলে কিছু একটা চিবোচ্ছে। বেশ মন দিয়ে।



অর্কর নিজেকে একটা অপদার্থ, একটা ক্লীভ মনে হল। সুতপা ঠিকই বলে। অর্কর মনুষ্যত্ব নেই। অর্ক বাপ হয়নি। অর্কর বাপ হবার ক্ষমতা নেই। মিস্যারেজ হয়ে যাওয়াটা যেন শুধুই অর্কের দোষ!

অর্কর আজ তাড়া নেই। ল্যাদ খাবে। রোববারের নির্ভেজাল ল্যাদ। চাইলে লেকের পাশ থেকে একটু ঘুরে আসা যায়। লাইব্রেরির বই। খুচরো প্রেম দ্যাখে অর্ক। চিড়িয়াঘর এই দুনিয়া। লাভিং বার্ডস। কুকুড় কু। হারামি হেডমাস্টারটাকে আবার স্বপ্নে দেখেছে কাল। নামেই হেডু। হারামির হাতবাক্স। মিনমিনে বজ্জাত শালা। হাত ধুয়ে পড়ে ছিল ছেলেটার পেছনে। তো সে তো রেয়াত করলো না আর! ঘেমে যাচ্ছে অর্ক। প্রেসার ট্রেশার। একবার মাকে ফোন দিতে হবে আজ। ভিটে আগলে যক্ষ বুড়ি হয়ে আছে মা। বোন তাও আসে মাঝে মাঝে। উৎসব পার্বণে। সুতপার সাথে কয়েক বছর আগেঅন্দি ভালোই ছিল রিস্তানাতা। আজকাল সুতপা এড়িয়ে যায়। অর্ক বোঝে। ওর একটা হালকা পাপবোধ তৈরি হয়েছে। সুতপার সেরকম দোষ তো নেই। এক্সিডেন্ট একটা। বাচ্চাটা এলে কি দুজনের মধ্যে সেতু তৈরি হত?? সেতু সেতু মানে ব্রিজ। ঘামছিল অর্ক। ডিসেম্বরের হালকা শীতেও... সেদিনতো ওরও একইসাথে ফেরার কথা ছিল... অর্ক বেইমানি করেছে নাকি ব্রিজটা!! দৃশ্যটা মনে পড়তেই গলার কাছটা টক টক... কাল রাতে একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছে। রামের গোটা বোতল... ঘুমোতে চায় অর্ক। সস্তা মদের ঘুম। সাথে কুমুদ কাকুর দোকানের ছোলা ভাজা। শিক্ষক তো কি, ঢপবাজিশালা! ফুল, মালা, বেলপাতা। নাটক। সুতপা বুঝবে না। অর্ক তো আর ইউনিভার্সিটির ভদ্র ছেলেটি নেই আর! হালকা চাপ দাড়ি, হাতে সবসময় তিনটে বই। পুওর ম্যাথস! পুওর গাই...

#####

লেকের এপাশটা ভালো। চেনা মুখ কম। সাদা ট্যাক প্যান্ট পরা ভদ্রলোককে আগে দেখেনি অর্ক। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলেন ওকে। পরশুর এফেক্ট হতে পারে। নাও হতে পারে। ফিফটি ফিফটি চাস। ফোন বন্ধ অর্কর। এটাই সহজতম পথ মনে হয়েছে নিজেকে বাঁচাবার। গৌতম পারেনি। অর্ককে পারতে হবে। নিউজফিড গুলো মনে পড়ছিলো অর্কর। কদর্য। ঘিনঘিনে। গৌতম জল চাইছে। বাড়ানো হাত। ছেলেদের ফুটবল প্র্যাকটিস করাতো গৌতম। অসম্ভব ভালো ট্রেনার। ফিট বডি। হিংসে হত মাঝেমাঝে। বুক ফাটিয়ে হাসি। সুতপা অন্দি চমকে গেছিল প্রথম দিন। মিশুকেও ছিল গৌতম। গৌতম স্যার মানেই অন্যকিছু। বিল্টে খুব কাঁদছিল। চায়ের দোকানের কাজ ছাড়িয়ে ওকে স্কুলে ফেরত এনেছিল গৌতম। লক্ষীপুজোর পর এক টিফিন ক্যারিয়ার নারকেল নাড়ু এনেছিল বিল্টে। এই তো সেদিন!!!

সুতপার ব্যাপারে যেটুকু শলা পরামর্শ সব গৌতমের সাথে। সাইক্রিয়াটিস্ট, ফোন নাম্বার সবই।

গৌতম জল চাইছিল। তেষ্ঠা। চাঙড়। হাত। খান দশেক মাছি। হাতটা ওর ছিল বোঝা যায়নি প্রথমে। ওই পলার আংটিটা, শালা আঘাত থেকে মুক্তি!!! খুব জোরে পুকুরটায় ঢিল ছুঁড়লো অর্ক। যতটা জোরে পারা যায়। গোল গোল রিং। ছোট থেকে বড়। প্রথমটায় সুতপা অর্ক। পরেরটায় গৌতম, ফুটবলমাঠ, গৌতমের ছেলে। শেষটায় গৌতমের বডি, স্কুলের ছেলেরা, রজনীগন্ধার মালা। গৌতমের মুখ দেখা যাচ্ছে না। প্লাস্টিক। শুধু হাতটা, হাতটা... আর চাঙড়। কংক্রিট স্ল্যাব। ঢালাই। উঠে দাঁড়াল অর্ক।

#####

সুনীল এসেছে। সাথে কেদার, তারক, অনিমেঘ, পাপন, রাতুল। স্কুলের আরো একগাদা ছাত্র। বর্তমান, প্রাক্তন। কোনোমতে তালা খুলে ভেতরে ডাকলো অর্ক।

... “চলুন না স্যার। কিছু তো হবে, যে যেভাবে পারি”...



ঘোলাটে চোখে তাকাল অর্ক। শব্দগুলো চেনা। বৈপ্লবিক। এককালে, যখন অর্কের বিপ্লবে আস্থা ছিল। রক্ত গরম। ম্যাদামারা নয়। অর্ক জানে এসবে লাভ নেই। বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট। মিছিল মোমবাতি। সেলফি, স্লোগান।

... “না... তোরা আয়।” ঠান্ডা গলায় উত্তর দিল অর্ক। ছেলেরা জানে স্যারের না মানে না। গৌতম স্যার ফ্লেক্সিবল ছিলেন। ম্যানেজবল। ফুটবল মাঠে, হই হই করে পিকনিকের পারমিশন দিতে। গৌতম স্যারই বরং অর্ক স্যারকে টেনে আনতেন।

“কিন্তু এ তো অন্যায় স্যার”... তারকের গলা কাঁপছে। চোখের মিহি জলটা টের পাচ্ছিল অর্ক। শিরশির করছে গা। বিড়ালের ঠোঁট চাটা মনে পড়লো হঠাৎ। মাছবাজারে। গৌতমের হাতে চাপ চাপ রক্ত। আঁশ বটির গায়ে যেমন।

“আ বে, গাঁইতিটা কোথায় রে”...

খিস্তি, বুলডোজার, সামরিক বাহিনী, সাদা পোশাক পুলিশ, বস্তির ছেলেরা, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো, বাচ্ছা, কৌতূহলী জনতা আর মিডিয়ার সস্তা হলুদ বাইট...

“এখনো বেঁচে আছে, দেখুন আঙুলগুলো, জল চাইছে জল, এত কিছুর পর অসহ্য সহ্যশক্তি নিয়ে”...

দৌড়ে বেসিনের দিকে গেল অর্ক। হড়হড় করছে হলুদ তরল। পাজামার গিঁট কোনোমতে হালকা করতে হবে। তলপেটে অসহ্য কামড়। সুনীল এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। কাঁধে হাত। পিঠে ক্রমাগত হাত বুলাচ্ছে। হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো অর্ক। প্রথমবার...

#####

গোটা মিছিলে প্রায় জনা আশি লোক। কতগুলো পরিবার থেকে আসতে পারে এরা। একবার ভাবলো অর্ক। সামনের টার্নটা ঘুরতেই সেই দৃশ্য। হাঁ করে ঝুলে রয়েছে সামনের দিকে। ধসে গেছে নিচটা। এখনো ঠিক হিসেব নেই, মোট কতজন। ঘেরা জায়গা। পুলিশের পাহারা। কোনো আওয়াজ নেই মিছিলে। একটা পাটাতন। সাদা চাদরের মত পাতা। বেশ কিছু ছবি। ছোট, বড়। ফুলের পাপড়ি, মোমবাতি। বিল্টে এগিয়ে এসেছে। হাতে গৌতমের ছবি। শক্ত করে আঁকড়ে রেখেছে। হাঁটু গেড়ে গৌতমের ছবিটা রাখলো বিল্টের। দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হল... বিল্টে কাঁদছে না এখন। শক্ত চোখ মুখ...

সুনীল কথা বলছে। মৃদু। অর্ক কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। হাফ সোয়েটার পরা গৌতমের ছবি দেখছিল। চকচকে চোখ। ব্রিজের তলায় চলে গেল বেমালুম। অর্ক খাতা দেখছিল। দুদিন পরেই অনুষ্ঠান ছিল। অগ্রগামীর। বার্ষিক রক্তদান উৎসব।

“তুই একটু ম্যানেজ করবি গৌতম? আমার এই খাতা কটা...”

“শালা, তুই বেইমান হয়ে যাচ্ছিস অর্ক, বলেছিলি কিন্তু যাবি”... শালা বলে জিভ কাটলো গৌতম!

কাঁচুমাচু করছিল অর্ক। আর এক ঘন্টা হলে এই বাস্তবতা শেষ হয়। কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল গৌতম।

#####

একটু পা চালিয়েই ফিরছিল অর্ক। একটু বাজার করে ফিরবে। সুতপার ধরানো ফর্দ। শীতের সবজি, চিড়ে, বাদামের প্যাকেট। কমলালেবু জোড়া কয়েক। সুতপা ভালোবাসে...

ভাইব্রুট হচ্ছিল ফোন। বোঝেনি আগে। স্কুলে থাকাকালীন সাইলেন্টই থাকে ইন জেনেরাল। নিশ্চয়ই গৌতম। কিছু দরকার পড়েছে। খারাপই লাগছিল অর্কর। তখন কেন যে গেলোনা !!!

“তুই কোথায়” ... সুনীলের নাম্বার, ওর আবার এসময় কি দরকার ...

“কেন, এই একটু বাজার ...”

“গৌতমের সাথে কোনো যোগাযোগ হয়েছে তোর ?? শোন, শোন অর্ক, কাছ বাবুর বাজারের কাছে ব্রিজটা, ব্রিজটা ভেঙে পড়েছে ... গৌতম ফেরে তো ওই রাস্তায় ... ওর ফোন নট রিচেবল” ...

বাকি কথাগুলো শুনতে পায়নি অর্ক। পরপর দশবার ডায়াল করেছিল। ঘ্যানঘ্যান করছে অটো ভয়েস। অর্কর হাত পা কাঁপছিল। কোনোমতে দুটো অটো পাল্টে পৌঁছেছিল জায়গাটায়। থিকথিকে ভিড়। এম্বুলেন্স। স্ট্রেচার ...

#####

শহর নিজের মতোই। মল, ট্র্যাফিক, হোর্ডিং, রাজনীতি, উৎসব, কোলাহল। খবরের কাগজের নিজীব কঠিনটুকু মরে যায় তাড়াতাড়ি। বলা ভালো, মমি হয়ে যায়। মাথাব্যথা, সে তো দুদিনের। পরিবার পিছু ক্ষতিপূরণ, একটা চাকরি। কোনোমতে। লোকাল দাদা দিদি, দরাদরি ইত্যাদি। এতদিন অর্ক যে বিশেষ মাথা ঘামিয়েছে, তাও নয়। অর্কর গ্রাফে বুটকামেলা নেই। সুতপা বলে মাঝেমাঝে, “খোলসে ঢুকে থাকা মেরুদণ্ডহীন তুমি” ... প্রথম প্রথম খুব গায়ে লাগতো অর্কর। চোখ লাল। তারপর ধীরে ধীরে অভ্যাস। অভ্যাসে কী না হয় ! একথা বুঝতে কিছু বছর মাত্র। যেমন এই সহবাস, অভ্যাসের দাস। রঞ্জারও অভ্যাস হয়ে যাবে। গৌতমের ছবিতে মালা দেবার। রোজ, তারপর কমবে। ভুলবে। একদিন শুধু ছায়া। মায়াও ...

বডিটা বের করতে বেশ ধকল। বড় স্ল্যাব। খেঁতলানো মাথা। ঘিলুর নরম অংশ। গৌতমের হাতের পলার আংটি। ওর মা অনেক হুজুত করে পরিয়েছিল। ডানপিটে ছেলের রক্ষাকবচ। পরপর চাঙর কেটে গোটা আটেক দেহ। মহিলার মাথা ভরা সিঁদুর। হাতের পাশে ইশকুল ব্যাগ। “বাচ্ছি ভি হ্যায়, উধার” ... হাসপাতালে মিস্টার ভৌমিকের মুখ ভেসে উঠলো হঠাৎ, “ওই আর সরি, মিনিমাম চান্সেস ছিল” !!

সুতপার সাথে সেতু কী তখন থেকেই ? এরকম নড়বড়ে, ভিতরে ফাঁপা। অর্ক চেষ্টা করছিল প্রাণপণ। রাস্তার জ্যাম ডিঙিয়ে ... বাথরুমে পা পিছলে পড়ে যাওয়াটা তো অর্কর জন্য নয়। অর্ক অসংসারী, বেহিসেবি, উদাস। নিজের বাচ্চাকে পৃথিবীতে আনার দায় যেন সুতপার একারই ! রক্তমাংসের পুটুলি প্রাণ আলো দেখার আগেই ... কত তারিখ, কোন বছর ?? ভাঙন ...

“দয়া করে বিরক্ত করবেন না, না, না, সম্ভব নয়। প্লিজ” ... ফোন সুইচ অফ করে দেয়া ছাড়া আর উপায় নেই। নিরুপায়। ছিনে জোঁকের দল। কতক্ষণে বেচবে, কত রোমাঞ্চকর প্রয়োগবিধি, সেন্টিমেন্টের সুড়সুড়ি, চ্যানেল, টি আর পি ... মৃত্যুকে নিয়েও ব্যবসা, রাজনীতি। কাদা ছোড়াছুড়ি। গৌতমের ছেলেটার মুখ ... ন্যাড়া মাথা। কত ক্ষতিপূরণ পেলে পূর্ণ হবে ওর জীবন !

#####

ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলল সুতপা। হাতড়ে হাতড়ে সুইচ। প্রায় সন্ধ্য। অর্ক বেরিয়েছে হয়তো কোথাও। স্তব্ধ বাড়ি। অবশ্য দুটো মানুষ থাকাটাও ভূতের মতোই প্রায়। কথাবার্তা বিশেষ নেই। খুব প্রয়োজন না পড়লে। অর্ক আজকাল বাইরের ঘরে শোয়। পাশবালিশ পড়ে যায় নীচে। ওর শোয়া খারাপ। বড্ড এদিক ওদিক করে। কতদিন চাদর টেনে

দিয়েছে গায়ে। বোঝেনা। আদুল গা। চোখ থেকে জল ছলকে গায়ে পড়েছিল অর্কর। সুতপার চোখ। নোনতা জল। মুছে নিল শেষে। জানাতে ইচ্ছে করে না। যেটুকু না করলে নয় শুধু ততটুকু। সকালের ভাত, ডাল, ভাজা, মাছের ঝোল। টিফিনের রুটি তরকারি। রাঁধুনি রেঁধে দিলে সুতপা গুছিয়ে দেয়। সেতুবন্ধন। সিমেন্ট বালি। সুতপা জানে ব্রিজটা নড়ছে। সাঁকোটো দুলছে। যে কোনোদিন ভাঙবে। শহরের ওই অপয়া ব্রিজের মত। গৌতমদা নেই। অর্করও নাকি যাবার কথা ছিল!! আধুনিক শহর। চলমান শহর। ভেঙে পড়ল ব্রিজের কিছুটা অংশ। তাসের ঘর। চাপান উতোর। গোটা স্কুল বাস। একটা মিনি, তিনখানা লরি। এত গুলো মানুষ...

গৌতমদার বডিং ছিল অর্কর সাথে। কলিগ নয় শুধু, জিগরি দোস্ত। সুতপাও পারছেন। অর্কর সামনে দাঁড়াতে ভয় হয়। এতদিনে বাচ্চাটা বছর পাঁচেক হত প্রায়। গৌতমদার ছেলের মতন। অর্ক একটু দায়িত্বশীল। সংসারে স্থির...

শুয়ে আছে অর্ক। ঘুমিয়ে গেছে। ক্লান্ত। কবিতার খাতা...

“তোমায় তোমাদের মত
রাখতে চেয়েছিলাম
আর শহর চেয়েছে সন্ধ্যা
বলো, আমি মিথ্যে কিনা
দূরে দূরে সরে থাকার রাতে!”

পাতায় অসংখ্য আঁকিঝুঁকি। বাচ্চার হাত আঁকতে চেয়েছে। পারেনি। দুবার গৌতম লেখা। সুতপার নাম। পাশে “আমি খুব খারাপ”...

ভেঙে যাচ্ছে সবকিছু। বাধা, প্রতিরোধ, অভিমান! অর্ককে ধরে বাঁকাচ্ছিল সুতপা। হিমালী সম্প্রপাত। বরফ গলন। অর্ক হতভম্ব হয়ে গেছে। ঘুম চোখে আধো আলোয়।

“কেন অর্ক, কেন...??”

দলা পাকিয়ে যাচ্ছে সুতপার আওয়াজ। তীব্রতা। বুকে মাথা গুঁজে। কবে যে সেই, কতদিন আগে...

হাতের বেড়ে ভেঙে যাওয়া সুতপা নাকি গড়ে ওঠা সম্পর্ক... গোঙানির মত একটানা...

“গৌতমদার ছেলে অর্ক, যদি আমরা দায়িত্ব নি, যদি, কিছুটা, কোনোভাবে...”

সুতপার ঠোঁট ছুঁইয়ে শান্ত করছিল অর্ক। ধীরে ধীরে... একটা একটা ইঁট, অনেকগুলো মানুষ...

ব্রিজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে... স্পষ্ট, আরো আরো!!!



উপাসনা নন্দী - জন্ম '৭৯-এ খড়দায়, উত্তর চব্বিশ পরগণায়। গানের ভিতর দিয়েই কেটেছে কিশোরীবেলা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণি প্রথম। বর্তমানে ভূগোলের শিক্ষিকা। আলমারীর কোণা ঢাকা পড়েছিল কবিতালেখার আকাশ। যে যাই বলুক না কেন ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় নানা কৌতূহলী লেখা নিয়ে ফেসবুকে সদাহাস্য মুখ। ধুমকেতুর মত বাংলা কবিতায় ঢুকে পড়েছেন তার নতুন কবিতার বই নিয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, গান, সাজগোজ, একলা মায়ের সংসার, রান্না খাওয়ার উৎসাহ এই নিয়েই শব্দ যাপন। এখন ভরসা কবিতার অন্তরমহলে।

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

সোনার চুল

বিপিন বাবুর ফ্যামিলিতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল।

বাপ, ঠাকুরদা, কারোর মাথার চুল বুড়ো বয়সেও পাকেনি। দিব্যি ঘন কালো, ঠাস বুনাট চুল।

বিপিন বাবুর বয়স হয়েছে ষাট-এর কাছাকাছি। বাড়ির নিয়ম মেনেই তাঁর চুল দিব্যি কালো কুচকুচে। বন্ধুরা এই নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে ঠিকই কিন্তু বিপিন বাবুর কেশ গর্ব তাতে খর্ব হয়না।

বিপিন বাবুর বাড়ি মালদায়। খুব একটা অবস্থাপন্ন নন। পুরোনো আমলে কিছু জমিজমা জমিদারি ছিল। কিন্তু এখন সেসব কিছু নেই। শুধু পৈতৃক বাড়িটাই সম্বল।

কলকাতায় চাকরীসূত্রে থাকতে হয়। এতো খরচ বলেই পরিবারকে কোলকাতায় নিয়ে আসেননি। শনি, রবি বা ছুটি পড়লে তখন মালদা যান।

বিপিন বাবু সেদিন সকালে অফিস যাওয়ার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়েই হঠাৎ আঁতকে উঠলেন। মাথার একরাশ কালো চুলের মধ্যে চকচক করছে ওটা কী? একটা পাকা চুল মনে হচ্ছে।

যা কিছু বংশগৌরব সব গেলো। মনের দুঃখে বিপিন বাবু খুব সাবধানে চুলটাকে ধরে পটাং করে সমূলে উৎপাটন করলেন। তারপর চোখের সামনে নিয়ে এসে দ্বিগুণ চমকে গেলেন। চুলটার রং সোনালী। বেশ উজ্জ্বল সোনালী। এরকম সোনালী রঙের চুল তিনি কোথাও দেখেননি।

বাথরুমে গিয়ে সদ্য কেনা নারকেল তেলের কৌটো, শ্যাম্পুর শিশি বের করে তার উপাদান, উপকরণগুলো ভালো খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন। একী কোনো কিছুর সাইডেফেক্ট? অফিসের সহকর্মী সুরঞ্জন বাবুর চুলগুলো একবার বেগুনি হয়ে গিয়েছিলো এক বিশেষ জাতের বেগুন খাওয়ার পর।

একটু চিন্তিত মুখেই খুব সাবধানে চুলটাকে পার্সের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন বিপিন বাবু।

অফিসে গিয়েও কিছুতেই কাজে মন বসলো না। মাঝে মাঝেই পার্স খোলেন আর চুলটা বের করে দেখেন।

চোখের ভুল নয়তো? আবার কাউকে দেখাতেও ভরসা পান না। দিনে বেশ কয়েকবার টয়লেটের আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন মাথায় আরও কোনো এরকম চুল দেখা যাচ্ছে কিনা।

অফিস থেকে ফেরার সময় তার বন্ধু শ্রীপতি জুয়েলার্সের মালিক রমাপতি কে চুলটা দেখালেন। তার তো চক্ষু ছানাবড়া। চুলটাকে ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বললেন – “এ যে খাঁটি সোনার মিহি সুতো ভায়া, কোথায় পেলে এ জিনিস?”

বিপিন বাবু গম্ভীর হয়ে চুলটা ফেরত নিয়ে কিছু জবাব না দিয়ে সোজা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন।

এর মধ্যে বাড়িতে বারদুয়েক ফোন করেও চুলের কথা বলবো বলবো করেও বলতে পারেননি। চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া এসব কথা বললে বাড়ির লোকেরা ধরেই নেবে হয় বিপিন বাবু পাগল হয়ে গেছেন কিংবা উল্টোপাল্টা নেশা ইত্যাদি শুরু করেছেন।



সেদিন রাত্রে এ পাশ ও পাশ করেও তাঁর ঘুম এলো না। মাঝে মাঝেই সেই অলৌকিক সোনার চুল পার্স থেকে বের করে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন।

পরদিন সকাল হতেই ছুটলেন বৈজ্ঞানিক বন্ধু অখিলেশ মাইতির বাড়ি। অখিলেশ-এর বহু বিষয়েই বিস্তারিত পড়াশোনা।

দেখা হতেই হাসি মুখে অখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন। – “আরে কী খবর ভায়া? বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। বোসো, বোসো। চা চলবে তো?”

– “হ্যাঁ তা চলতে পারে। একটা দরকারে তোমার কাছে এলাম।”

অখিলেশ বিপিন বাবুকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বলে উঠলেন – “তোমার চোখ মুখের এরকম অবস্থা! রাতে ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে। জামাটাও দেখি উল্টো পরেছ। কোনো বড় সমস্যায় পড়েছো নাকি?”

– “সমস্যা ঠিক না, মানে বললে হয়তো তুমি ঠিক বিশ্বাস করবে না।”

– “আহা বিশ্বাস অবিশ্বাস পরের ব্যাপার। কী হয়েছে শুনি?”

– “আচ্ছা মানুষের চুল কি সোনার হতে পারে?”

অখিলেশ শুনে মুচকি হেসে বললেন, “মানুষের মাথায় সোনার চুল, এ তো ঠিক হাঁসের সোনার ডিম পাড়ার মতো ব্যাপার স্যাপার। এসব রূপকথার গল্পে হয়। তবে হ্যাঁ সোনালী রঙের চুল তো হতেই পারে।”

– “আরে না না সে কথা বলছি না, খাঁটি সোনার চুল। সে আমি পরীক্ষা করিয়েই জেনেছি। এই দ্যাখো”

চুলটা বের করে খুব সাবধানে অখিলেশের হাতে দেন বিপিন বাবু।

অখিলেশ হতবাক হয়ে চুলটা ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। তারপর বলেন, “এ কি তোমার মাথার ফসল? এমন জিনিস তো বাবার জন্মে দেখিনি। অবশ্য কিছুদিন আগে প্যারিসের মেরি কুরি ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর ফিলিপ ওয়াল্টারের একটা আর্টিকল পড়ছিলাম একটা জার্নালে। চুলে অ্যামিনো অ্যাসিড এর তারতম্যের কারণে নাকি কেরাটিনের জায়গায় গোল্ড ন্যানোপার্টিকল থাকা সম্ভব। কিন্তু এইরকম সোনার চুল দেখবো স্বপ্নেও ভাবিনি।”

বিপিন বাবু পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন আরও কয়েকটা সোনালী চুল দেখা দিয়েছে ওঁর মাথায়। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মাথাটাই যে একটা সোনার খনি হয়ে উঠবে কে ভেবেছিলো।

কিন্তু লোকের চোখে পড়লেও তো মুশকিল। রাস্তা ঘাটে হাঁটাই তার বিপজ্জনক হয়ে যাবে। এই ভেবে যে কটা সোনার চুল তাঁর চোখে পড়লো, উৎপাটিত করে সযত্নে পার্সের মধ্যে ভরে রাখলেন।

পরের দিন শনিবার ট্রেনে বাড়ি ফিরছেন বিপিন বাবু। এই গরমেও মাথায় একটা হনুমান টুপি পরে নিয়েছেন। চারপাশের লোকজন কিরকম অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে। পাগল ভেবে নেওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঘরের লোকজন জানতে পারলে যে কী হবে সেটাই ভাবছেন বিপিন বাবু।

হঠাৎ মাঝরাতে ট্রেনে শোরগোল শুনে উঠে বসলেন। ট্রেনে ডাকাত পড়েছে। বিপিন বাবু ভয়ে দরদর করে ঘামতে লাগলেন। এদের সবার হাতে ভোজালি, চাপাতি। বিপিন বাবুকে দেখে একজন খুব মজা পেয়ে বললো – “এই যে কাকুর খুব গরম লেগেছে।”

– “যা যা আছে দিয়ে দিন কাকু নইলে কিন্তু আজকেই খেল খতম।”

তারপর তারা বিপিন বাবুর ব্যাগপত্র কেড়ে, জামাকাপড় তছনছ করে দেখতে শুরু করলো। কিন্তু সেরকম কিছুই পেলো না। রেগে গিয়ে টুপিটা ধরে টানাটানি করতে লাগলো। কিন্তু বিপিন বাবু কিছুতেই টুপি খুলতে দেবেন না। প্রাণপণে সেটা খিমচে ধরে রইলেন। তবে ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ পেরে উঠলেন না। টুপিটা খুলে ওদের হাতে চলে এলো একসময়।

বিপিন বাবুর মাথায় রাতারাতি বেশ কয়েকগাছি সোনার চুল গজিয়ে গেছে। তাই দেখে ছেলেগুলো তাজ্জব।

একজন টেনে টেনে দু তিনটে চুল উপড়ে নিয়ে ভালো করে পরখ করে দেখে বললো, “ওস্তাদ এতো খাঁটি সোনা। কপাল খুলে গেলো।”

ওদের মধ্যে যে সর্দার গোছের সে বললো – “এক মাথা সোনার চুল। ভাবা যায়না, এক কোপে এর মুণ্ডটাই উড়িয়ে নিয়ে চল। গোটা ট্রেনেও এতো সোনা পাওয়া যাবে না। হা ভাতে লোকরা সব বসেছে। ইমিটেশন ছাড়া কিছুই পরেনি” বিপিন বাবু বলির পাঁঠার মতো ম্যা ম্যা করে উঠলেন।

সকাল হয়ে গেছে। বিপিন বাবুর ঘুমটাও “চায়ে, গরম চায়ে” ডাকে ভেঙে গেলো।

নিজের ঘাড়, গলা, মাথায় ভালো করে হাত বুলিয়ে দেখলেন তিনি। নাঃ সব যথাস্থানেই আছে। খামোখা একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে... ঠোঁটের কোণে অজান্তেই হাসি ফুটে উঠলো। সিট থেকে উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে মাটির ভাঁড়ে গরম চা কিনে চুমুক দিলেন তিনি। হঠাৎ কী মনে হতেই তাড়াতাড়ি পার্সটা খুলে দেখলেন বিপিন বাবু। আবার তাজ্জব হওয়ার পালা। পার্সের সোনালী চুলগুলো তাদের রং হারিয়ে সাদা স্বাভাবিক পাকাচুলে পরিণত হয়েছে। এ কী ব্যাপার! মনটা একটু খারাপ হয়ে গেলো তাঁর। কিন্তু স্বপ্নটার কথা ভেবে একটু নিশ্চিত হলেন। এ কদিন রাতের ঘুম একেবারে উড়ে গিয়েছিলো। এখন যেন একটু চাপমুক্ত হলেন।

বিপিন বাবুর মাথায় এখনো সোনালী চুল দেখা দেয়। তবে মাথা থেকে ছিঁড়লে দু তিনদিনের মধ্যেই সেটা রং রূপ বদলে ফেলে। বাইরের লোকেদের অবশ্য বলেন যে চুলে সোনালী রং করেছেন। কিন্তু বিপিন বাবু তো মনে মনে জানেন যে মাথায় এরকম সোনার চুল পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই আছে।



ডঃ দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। জন্ম – মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে। কলকাতার লেডি ব্রোডও কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৈদিক সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। ব্যাঙ্গালোরের জৈন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেছেন। সম্পাদনা করেন বাংলা কিশোর ওয়েব ম্যাগ ম্যাজিক ল্যাম্প। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির শুরু। লিখতে ভালোবাসেন কবিতা ও ছোটগল্প। ছোটদের জন্য প্রথম গল্প সংকলন “সাত আকাশের ওপারে” (নান্দীমুখ প্রকাশন ২০০৫) প্রকাশিত হয় কলেজ পড়ার সময়। কবিতার সংকলন – কবিতার পঞ্চপ্রদীপ (দ্বীপ প্রকাশন ২০১৫), মেঘ বৃষ্টি কথা (ধানসিঁড়ি প্রকাশন ২০১৮), থ্রি, একটি থ্রিলার সংকলন (ফ্যাভ বুকজ পাবলিকেশন ২০১৮)। এছাড়াও কিশোর ভারতী, শুকতারা, আনন্দমেলা, প্রভৃতি পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন ওয়েবম্যাগে গল্প, কবিতা লিখে থাকেন। এই প্রথম প্রাপ্তমনস্ক থ্রিলার লিখছেন। লেখালেখির বাইরে কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ করতে, ছবি আঁকতে, ও বই পড়তে ভালোবাসেন।

রজত ভট্টাচার্য

সংসপ্তক

যুদ্ধের আজ ত্রয়োদশ দিন। সূর্যদেব কুরুক্ষেত্রের রক্তরাগ বক্ষে নিয়ে অন্তিমিত প্রায়। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু অগুপ্তি শবদেহ – মানুষ, ঘোড়া, হাতি, উট। বীরভদ্র কোমরবন্ধ থেকে জলপূর্ণ বাঁশের পাত্র বার করে কয়েক টোঁক জল খেল। শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে যুদ্ধ শুরু করেছে। আজই কুরুসেনাপতি তাকে সংসপ্তক পদে অভিষিক্ত করেছেন। প্রত্যেক সেনানীর কাছে এ এক মহাভীষ্ট সম্মান। সে শপথ নিয়েছে – হয় অর্জুন বধ না হলে অগ্নিদেবের কাছে অম্মসমর্পণ। কোনো মধ্য পন্থা নেই। সারাদিন সে বারবার চেষ্টা করেছে অর্জুন কে কোনঠাসা করার। সঙ্গীরা একে একে ভূপতিত। উতঙ্ক, বীরবাহু, সামন্তক, মহাবলী – ভ্রাতৃসম সহযোদ্ধাগণ। অমিতবল এই অর্জুন। অব্যর্থ তার নিশানা। দাবানলের মত যুদ্ধক্ষেত্রের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিচরণ করছে। তার রথ কপিধ্বজ, যাদব কুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ তার সারথী। বীরভদ্রের প্রকৃত সেনাপতি।

দ্বারকায় জন্ম বীরভদ্রের। মথুরানাগরের খালি গল্পই শুনেছে। দধি, দুগ্ধ আর ঘৃতের সুগন্ধ আর কালীয়দমনের গল্লের মাঝে তার শৈশব কেটেছে। সামান্য আহীর পরিবারে তার জন্ম। পিতা গোপালক, মাতা গৃহকত্রী। আশৈশব – কৈশোর সে এই মহাপুরুষের গল্প – গাথা শুনেছে। শুনেছে কংসের মতন মহাবলশালী কি ভাবে পর্যদুস্ত হয়েছে। আর হালের খান্ডবদহন, সে তো তার মুখস্থ। কৈশোর থেকেই তার পরম আকাঙ্ক্ষা সেনাবাহিনীতে যোগদান করার। সে লড়াই করবে, দরকারে প্রাণ অবধি বাজি রাখবে তার সেনাপতির জন্য এই তার স্বপ্ন। পিতার মত ছিলনা, মাতারও না। একটি মাত্র ছেলে তাদের, কিন্তু তার আগ্রহের সামনে তাদের আপত্তি টিকলো না। মাত্র ষোলো বছর বয়সে সে সেনাবাহিনীতে যোগদান করলো। নগর থেকে বহু দূরে এক বিশাল প্রান্তরে সেনাবাহিনীর ছাউনি, তার মত আরো অনেক কিশোর, সদ্য যুবক এসেছে। তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হলো। দিনের পর দিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। শরীর আর মনকে শক্ত রাখার ব্যায়াম, অস্ত্র প্রশিক্ষণ, মানচিত্র নির্মাণ, রাতে তারা দেখে পথ চলার গোপন পদ্ধতি, আঘাত লাগলে প্রাথমিক চিকিৎসা, চকিত আঘাত ও অম্মগোপন পদ্ধতি, ঘোড়া ও রথ চালানো, সবই শিখল যত্ন করে। এক বছর প্রশিক্ষণ এর পর তাদের পত্তিনায়ক এসে সুখবরটি দিল। তাদের রাজকীয় সেনাবাহিনীতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সে ভয়ংকর নারায়ণী সেনাতে অভিষিক্ত হবে। বীরভদ্র চোখ বন্ধ করলে দিনটিকে ছুঁতে পারে। কয়েকশ নিশান উড়ছে, অশ্ব, উট, ও রথবাহিনী সারিবদ্ধ ভাবে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেনানীরা পদাধিকার অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে। গম্ভীর শঙ্খ নিনাদ এর সঙ্গে সুসজ্জিত রাজহস্তীতে চড়ে মহারাজ উগ্রসেন স্বয়ং অভিষেক ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। পরম সমাদরে তাকে মঞ্চ উপবেশনের আমন্ত্রণ জানানেন রাজপুরোহিত। স্বস্তিবাচন ও আশীর্বাচন এর শেষে রাজা আদেশ করলেন অনুষ্ঠান আরম্ভের। তখনই তার চোখ পড়ল মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবকের প্রতি। একজন শালগ্রাম, হিমাদ্রীতুল্য শুভ্র-গম্ভীর। বিশাল তার বক্ষ। এত দূর থেকেও তার বাহুর পেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আরেকজন যুবা পুরুষ। পীতবসন তার কৃষ্ণ অঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। তাকে দেখলে একটি কথাই মনে হয় ‘আহা কি সুন্দর’। অনুষ্ঠানের শুরুতে নবাগত সেনানী গনের দক্ষতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের পালা শুরু হলো। বীরভদ্রের অশ্বারোহণের বিশেষ দক্ষতার কথা মনে রেখে পত্তিনায়ক তাকে একটি অত্যন্ত কঠিন সামরিক অভ্যাস দেখানোর জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে মাটিতে রাখা একটি তরমুজকে শূলবিদ্ধ করতে হবে ও তারপর ঘোড়া নিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার নির্মিত প্রাচীর পেরোতে হবে। বীরভদ্র নিখুঁত দক্ষতায় তরমুজটিকে শূলবিদ্ধ করলো – কিন্তু মুশকিল হলো তারপর। তীব্র গতিতে বাঁক নিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রাচীর দেখে ঘোড়াটি ভয় পেয়ে গেল ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ভারসাম্য হারিয়ে সামনে ছিটকে পড়তে পড়তে বীরভদ্র মহাআতঙ্কে দেখল সে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রাচীর এর ওপর নিক্ষেপিত হয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু সে জ্বলন্ত অঙ্গার এর ওপর পড়ল না। ‘সপাং’

করে একটি শব্দ এবং কে যেন তার পায়ের গোড়ালি ধরে টান দিল পিছন দিকে। বীরভদ্র প্রাচীর এর ওপর না পড়ে পড়ল সামনে। সম্মিত ফিরে পেয়ে সে দেখল তার পায়ে জড়ানো একটি চাবুক যা সাধারণত সারথীদের কাছে থাকে। বিহ্বল বীরভদ্র চোখ তুলে দেখল সেই দুই যুবাপুরুষ সামনে দাড়িয়ে। কৃষ্ণাঙ্গ রাজপুরুষের হাতে চাবুকের হাতল। গভীর কৃতজ্ঞতায়, সাশ্রনয়নে সে একটি কথাই বলতে পেরেছিল ‘প্রভু’। মৃদু হেসে রাজপুরুষ তাকে বলেছিলেন ‘এখনো সময় হয়নি . . . দেখা হবে’। আর কথা হয়নি। সে পরে জেনেছিল তার রক্ষাকর্তা আর কেউ নয় – স্বয়ং কৃষ্ণ। বীরভদ্র মনে মনে ভেবেছে কিসের সময়, কবে দেখা হবে কিন্তু উত্তর পায়নি। যতই ভেবেছে, ততই প্রহেলিকা গাঢ় হয়েছে। কতবার সে ভেবেছে একবার তার সামনে যাবে, প্রহেলিকার অর্থ জিগ্গেস করবে। কিন্তু সে সামান্য সেনানী। রাজপুত্রের দর্শন সোজা কথা নয়। তা ছাড়া তিনি আর্যভূমির একজন প্রধান ব্যক্তি। বেশির ভাগ সময় রাজকার্যে তিনি বাইরে থাকেন। বীরভদ্রের মনের জিজ্ঞাসা মনেই থেকে যায়।

যুদ্ধের দামামা বাজতেই তাদের ওপর আদেশ এলো যাত্রা শুরু করার। ধর্মযুদ্ধ শুরু হবে। এক দিকে কৌরব পক্ষ – যার সেনাপতি স্বয়ং ভীষ্ম, সাথে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রের একশ পুত্র। অপর দিকে যুধিষ্ঠির ও তার মহাপরাক্রমশালী ভাইরা। দুর্যোধনের দৌরাভ্যের কথা সর্বজন বিদিত। বীরভদ্রের শিরায় – ধমনী তে রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। হোক মহাবলী, কিন্তু ওই দুর্যোধন কে যদি একবার সে রণভূমি তে পায়, তবে দেখিয়ে দেবে ভারতবর্ষে এখনো পুরুষ সিংহের কোনো অভাব নেই। কিন্তু বিধি বাম, কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে সে জানতে পারল তাদের যুদ্ধ করতে হবে কৌরব পক্ষের হয়ে। কপট দুর্যোধন তার চাতুরিতে আরেকবার সফল।

যুদ্ধ শুরু হলো। বীরভদ্র এত হাহাকার কখনো শোনেনি। মৃত, অর্ধমৃত, মানুষ ও পশুর স্তম্ভ চারিদিকে। বিরতিহীন, ক্ষমাহীন, বিবেকহীন হত্যালীলা চলেছে প্রতিদিন। অভিমন্যু হত্যার মত অতিনিকৃষ্ট অপরাধের সে একজন ভাগীদার। সে দিন প্রচণ্ড যুদ্ধে জয়দ্রথ-এর অসাধারণ রণকৌশল সবাইকে চমৎকৃত করেছে। ত্রুন্ধ অর্জুন শপথ নিয়েছে জয়দ্রথ বধের। তার পরদিন অতি প্রত্যুষে তার ডাক পড়ল শপথ নেবার। ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মার অধীনে তাকে যুদ্ধ করতে হবে।

কাজ শেষ হয়নি। অবসন্ন বীরভদ্র ভল্লের ওপর ভর করে উঠে দাঁড়াল। তার পরমপ্রিয় রৈবতক, তার অশ্ব, পাশে পড়ে রয়েছে। তার চোখ কাঁচের মত স্বচ্ছ। নাসারন্ধ্র দিয়ে অবিরল রক্ত পড়ে চলেছে। অর্জুনের পিছু ধাওয়া করতে করতে তাদের দলটি ভীমসেনের সম্মুখীন হয়েছিল। উত্তনক ভুল বুঝতে পেরে প্রাণপন চেষ্টা করেছিল এড়িয়ে যাবার। কিন্তু পথের ধারে মৃত ও অর্ধমৃত হস্তীর দেহ এক দুরাগম্য প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। তারা উপায়ান্তর না দেখে ভীমসেনের সম্মুখীন হলো। উত্তনক মারা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। প্রচণ্ড গদাঘাতে ঘোড়া সুদূর ছিটকে পড়ল। সিংহনাদ করে ভীমসেন তাদের আক্রমণ করলেন। পড়ে থাকা একটা রথের পশ্চাৎভাগ তুলে নিয়ে তিনি অবলীলাক্রমে তাদের নিক্ষেপিত তীর ও ভল্লের আক্রমণ ঠেকালেন। তারপর তারা লড়াই করেছিল – এই পর্যন্তই। বীরভদ্র জ্ঞান হারিয়েছিল। যখন হুঁশ ফিরল, সে দেখল সে চাপা পড়েছে রৈবতক এর নিচে। সম্ভবত ভীমসেন বুঝতে পারেননি যে সে জীবিত। রৈবতক এর শ্বাস নেবার ঘড় ঘড় শব্দে বীরভদ্র হুঁশ ফিরে পেল। অর্থহীন এই যুদ্ধ। সে শুধুমাত্র এক ক্রীড়নক। ন্যায় বা ধর্ম কোনকিছুর জন্যই সে লড়ছে না। শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তির স্বার্থের সংঘাতে সে জড়িয়ে পড়েছে। তার বাড়ির কথা মনে পড়ে। শান্ত, স্নিগ্ধ আভীর পল্লীটির কথা মনে পড়ে। মা হয়ত বা হাতের কাজ সেরে এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। পিতা গো-খাদ্য প্রস্তুতে ব্যস্ত। হঠাৎ রথচক্রের কর্কশ শব্দে তার চটকা ভাঙ্গে। একটি রথ এসে থামল। রথ থেকে কেউ একজন লাফ দিয়ে নামল এবং মৃদু স্বরে কিছু কথা হলো। বীরভদ্র ধীর পায়ে শব্দের উৎসের দিকে এগিয়ে চলল। একটি মৃত হস্তীর পাশ কাটিয়ে এগোতেই সে থমকে দাঁড়াল এবং আত্মগোপন করলো। সামনেই কপিধ্বজ, অর্জুনের রথ। ঘোড়াগুলি শ্বেতবর্ণ প্রস্তর মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রথের পাশেই এক ব্যক্তি জলপানরত। শালপ্রাণ্ড যোদ্ধা, তার ধনুক-বান রথেই রাখা। যোদ্ধাটি যদিও তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বীরভদ্র একনজরে তাকে চিনে ফেলল। এই সেই অর্জুন, মহাবীর অর্জুন, এই মুহূর্তে অসহায়,

অস্ত্রহীন। মুহুর্তের জন্য বীরভদ্রের মনে দ্বিধা জাগলো, অস্ত্রহীনকে আঘাত নিয়মবিরুদ্ধ, তাও পিছন দিক থেকে, এ এক চূড়ান্ত কাপুরুষতা।

কিন্তু এই যুদ্ধ নিয়মের গন্ডি বহু আগে পেরিয়ে গেছে, ভীষ্ম কে শিখন্ডির সাহায্যে ভূপতিত করা হয়েছে, অভিমন্যুকে হত্যা করেছে সপ্তরথী। কুরুক্ষেত্র বিবেক ও মানবতার বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে বহু আগে। ন্যায় যুদ্ধ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বীরভদ্র দৃঢ় হাতে ভল্লটি নিয়ে অগ্রসর হলো। সে ধীরে ধীরে মৃত হস্তীটির কাঁধের ওপর উঠে দাঁড়াল। মাত্র ছয় হাত দূরে তার অভীষ্ট লক্ষ্য, অসহায়, নিরস্ত্র। বীরভদ্র লক্ষ্য স্থির করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনলো। ধীরে ধীরে তার সমস্ত শরীর জ্যা-বন্ধ ধনুকের মত টান টান হয়ে উঠলো। এই বার বীরভদ্র সিংহনাদ করে লাফিয়ে পড়ল অর্জুনের ওপর, সমস্ত শক্তি দিয়ে ভল্লটি বিঁধিয়ে দিতে হবে। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে তাকালো তার দিকে, অসহায় তার দৃষ্টি। সরে যাবার সময় নেই। হঠাৎ বাতাসে তীব্র এক শব্দ হলো। কে যেন বীরভদ্রের গোড়ালি ধরে ভীষণ শক্তিতে মাটিতে আছড়ে ফেলল। হতচকিত বীরভদ্র উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ততক্ষণে দেৱী হয়ে গেছে। মহাবীর অর্জুন ফিরে দাঁড়িয়েছেন এবং ভীষণ ক্রোধে তার বুকে পা তুলে দিয়ে তার নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। তার হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ। বীরভদ্র দেখল তার গোড়ালিতে জড়িয়ে রয়েছে একটি চাবুক, সারথীদের চাবুক, আজ থেকে কয়েক বছর আগে যেটি তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। চাবুকের হাতল সেই কৃষ্ণবর্ণ যুবকের হাতে যার চোখে কোনো উদ্বেগ নেই, ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই। বীরভদ্রের মনের প্রশ্নটির সমাধান হয়েছে, সে শেষবার করজোড়ে বলল . . . ‘প্রভু . . .’।।



রজত ভট্টাচার্য, নিভৃত সাহিত্যচর্চা আর দুর্গম পাহাড়ে ভ্রমণ তাঁর ভালোলাগা। গদ্য ও পদ্যে সমান দক্ষ। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী। তাঁর গদ্যের অভিনব শৈলী বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

“আগুন, আশ্চর্য বস্তু, জ্বলার সময়ে প্রতিশ্রুতি।
যদিও নেভার পর ছাইরাশি, সহজে উড্ডীন . . .
তেমনই সমস্ত কাজ আসলে বুনন করা ছুটি
শৈত্যপ্রবাহের নীচে উলের পসরা নেওয়া দিন।”

— শ্রীজাত
বালি

যে - জ্যোৎস্না হরিণাতীত

সৌমিত্র চক্রবর্তী

গোলকিপারের বাবা

— “কোথায়?”, সুজন চোখের ঈশারায় জানতে চাইল।

পরমা সিরিয়াল থেকে চোখ সরালোনা। ইঙ্গিতটা বুঝে নিজেই পর্দাটা ঠেলে ঘরটায় ঢুকল সুজন।

পিলু খাটের উপর বসে আছে। মাথাটা নামানো। স্থির দেহটা খালি লাটুর মত ঘোরাচ্ছে একটা ফুটবলকে। সুজনের হঠাৎ যেন মনে হল তার কিছুই বলবার নেই। নিঃশব্দে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে-আসতে সুজন নিজের কাছেই খুব অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে যেসব কৈফিয়ত তলব করে চলেছিল মনে-মনে, যেসব প্রশ্নেরা যুদ্ধের সাজে সেজেছিল, হঠাৎ সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে যেন। তীব্র হতাশা বোধহয় অনেক সময় প্রশ্নদের মৃত করে দেয়।

‘একটু চা করো তো’, সুজন লিভিং রুমে ফিরে ধাক্কা দিয়ে সোফায় বসে পড়ল।

পরমা চা করতে যাওয়ার কোনও উদ্যোগ দেখালনা এই মুহূর্তে, “কথা বললেনা ওর সঙ্গে?”

— “নাঃ”, সুজন মাথা নাড়ল, “কি হবে পরমা! আসলে কি জানো, সাফল্য এমনি এমনি আসেনা, এরজন্য ভেতর থেকে একটা চাড় আসা দরকার। সে চাড়টা প্রতিষ্ঠির হতে পারে, নিজস্ব বা পারিবারিক সম্মানের হতে পারে, মোদ্দা কথা সামহাউ ইউ হ্যাভ টু মোটিভেট ইউরসেলফ! সেটাউ মিসিং।”

পরমা সুজনের পাশে উঠে এল, “তুমি হতাশ হয়ে যাচ্ছ সুজন। আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। তোমার ওকে প্রশ্ন করা উচিত। এমন তো নয় আমরা ওকে কিছু কম দিচ্ছি। তবু রেজাল্ট আসবেনা কেন? এটা ওর জবাব দেওয়া উচিত।”

সুজন পরমার দিকে তাকালো। পরমার ব্যাপারটা বৃহতে পারছে সে। মজুমদার বাড়িতে একটা আলাদা প্রতিপত্তি আছে পরমার, চিরকালই। যদিও সেটার মূল কারণ স্নেহতোষ আর সুজন, তবু উপভোগটা যেন পরমাই করে বেশী করে। মা বরং চিরকালই দল ছাড়া। সেই প্রতিপত্তির জায়গাটা একেবারে গোড়া থেকে নড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, কাজেই পরমার এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। সে নিজেও তো আজ সারাদিন অফিসে প্রচণ্ড অন্যমনস্ক ছিল।

“বেশ, কাল বলব’খন। আজকের দিনটা যাক,” সুজন ইস্যুটা আজকের মত থামাতে চাইল, আসলে তার নিজেকেও একটু গুছোনো প্রয়োজন এখন।

— “তোর মতামতটা জানতে পারি কি?” সুজন চায়ের কাপটি টাবিলে নামিয়ে জানতে চাইল।

কাল থেকে গৌজ মেরে আছে ছেলেটা। সুজন বোঝে, পিলুর এই চুপ মেরে থাকাটা খারাপ রেজাল্টের আফটার এফেক্ট নয়, আসলে রেজাল্টের পর যে প্রশ্নের বাড়-ঝাপটাগুলো আসবে বলে অনুমান করছে পিলু ও সেগুলোকেই এড়াতে চাইছে। আশ্চর্য্য! ছেলের উপর বিরক্ত হল সুজন। একজন ক্লাসে ওঠবার পরীক্ষায় ডিটেনড হয়ে যাবে, অথচ কনসিকোয়েন্সটা ফেস করতে চাইবে না। চূড়ান্ত এসকেপিজম! সুজন পিলুকে চেপে ধরতে চাইলো,

“রেজাল্ট এ’রকম কেন হয়ে গেল পিলু? পড়াশুনা করিসনি ভালো করে?”

— “না”।

— “কেন?”

— “ভালো লাগেনা”,



স্পষ্ট উত্তরটা পরমার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিল। সকাল থেকে অনেকটা সহ্য করছিল সে, “ভালো লাগে না ! ভালো লাগে না ! তাহলে কি করতে ভালো লাগে শুনি ? দিনরাত ফুটবল পেটাতে আর পরীক্ষায় ফেল করতে ? লজ্জা ! লজ্জা ! এ’বংশের কলঙ্ক তুই !”

সুজন হাত তুলে পরমাকে থামালো। পাশাপাশি ঘর দোর, হইচই করে মানুষকে জানিয়ে লাভ কি ! তাছাড়া ব্যাপারটার সিরিয়াসনেস ধৈর্য্য দাবী করে।

— “দেখ পিলু তুই তো জানিস, এই উইকের মধ্যেই আমাকে প্রিন্সিপালকে গিয়ে মিট করতে হবে। অ্যান্ড হি উইল সিয়োরলি আস্ক ফর অ্যান এক্সপ্ল্যানেশন; তুই-ই বল, আমি কি বলব ?”

সুজন আলোচনাটা একটা গতে ফেলতে চাইল, পারটিসিপেশন মেকস্ আ ম্যান রেসপনসিবল্।

পিলু মুখ তুলেছে। নির্লিপ্ত একটা ভঙ্গি ওর চোখে-মুখে,

“কিছু না। র‍্যাদার ইউ আস্ক দেম যে ওরা আমায় কোন যুক্তিতে ডিটেনড্ করল ?”

— “মানে ?”, সুজন হতবাক হয়ে গেল।

পিলু দৌড়ে শো-কেসটার সামনে দাঁড়ালো। মুখ-চোখ থমথমে, অভিমানের মেঘ শুধু বারবার অপেক্ষায়, “এগুলো কি ? অ্যা ? কি এ’গুলো ?”

পিলু হাত দিয়ে সাজিয়ে রাখা সার্টিফিকেট আর কাপ-মেডেল গুলো দেখালো,

“এ’গুলো পাইনি আমি ? পাঠায়নি স্কুল আমাকে দিনের পর দিন এখানে-ওখানে খেলতে ?” এই যে এই কাপটা, “দুড়মুড়িয়ে টেনে নামালো পিলু, এই টুর্নামেন্টটা দশ বছর পরে পেয়েছে আমাদের স্কুল। আর এটা আমার ম্যান অব্ দ্য ম্যাচের প্রাইজ, তখন স্কুলের মনে হয়নি যে সপ্তার্থ্য রোজ ক্লাস করতে পারছে না ? প্রিন্সিপাল স্যারই তো বলেছিলেন আমাকে, ক্যারি অন বয় ! তা হলে ?”

সুজন হতভম্ব হয়ে গেল, এমন একটা প্রতিক্রিয়া আশা করেনি সে। নিমেষের মধ্যে সুজনের মনে হল দুড়মুড়িয়ে এই ঘটমান বর্তমান থেকে সরে যাচ্ছে সে।

একটা মাঠ, তাতে অনেক ছেলের দৌড়দৌড়ি, একটা বল এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, বৃষ্টি নামল, অঝোরে বৃষ্টি, বাচ্ছাগুলো তবু থামছে না, দাপিয়ে-দাপিয়ে কাদা করছে গোটা মাঠটাকে। একটা ছেলে, কিছু দূরে, জানালার শিকের ভেতরে, দোতলায়, হাত দুটোয় শিক আঁকড়ানো, খেলা দেখছে, বৃষ্টি দেখছে, সে দেখে, খেলে না, ভেজে না। “খোকন, মাস্টারবাবু” — একটা হাঁক। ছেলেটা পিছন ঘুরেছে। ফিরে যাচ্ছে বাড়ির ভিতরে, চুপচাপ আকস্মিক ছেড়ে দেওয়া ইচ্ছে সুতো গুটোতে-গুটোতে।

পরমা রুখে দাঁড়িয়েছে, ও’সব বলে লাভ নেই পিলু। স্কুল — পড়াবার জন্য, কেরিয়ার — তৈরির জন্য, বল — পেটানোর জন্য নয়। কোনটার কি প্রায়োরিটি, সেটা তোর বোঝা উচিত। অনীকও তো ক্রিকেট খেলে, ফাস্ট হয় না ?

পিলু পাল্টা আক্রমণে গৌজ মেরে গেছে। পরমা কি সব বলেই চলেছে — বংশের সম্মান, বাপ-ঠাকুরদার পসার, জীবনের সুখ-শান্তি।

সুজন ধীরে-ধীরে ছোট্ট ব্যালকনিটায় দাঁড়ালো। সামনে একটা সাত-তলা। ওখানেই ছিল মাঠ’টা। এখন বহুতল। সময় পাল্টায়, পাল্টায় গঠন, পৃথিবী তো পরিবর্তনশীলই, তবে চাপা বিদ্রোহ পাল্টায় না কেন ? নাকি পাল্টায় ? পাল্টায় বলেই এমন ?

দুপুরে শুতে যাওয়ার সময়ই খেয়াল করেছিল, এখন এই সন্ধ্যাবেলায় সুজনকে দেখে আরও খারাপ লাগল পরমার। সকাল থেকে এক্কেবারে গুম মেরে আছে মানুষটা। স্বাভাবিক। পরমা নিজে নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘর থেকে আসা মেয়ে। বাবা সরকারি অফিসের কেরানী ছিল, একমাত্র দাদার অর্ডার সাপ্লায়ের বিজনেস আছে, থাকে ভাগে পড়া দেড়তলায়। একটু বেশী বয়সে বিয়ে করেছিল দাদা। তাই মেয়েটা ছোট, সেভেনে সব। কিন্তু সুজনরা তো অমন নয়। ব্যানার্জী হাউস চেনেনা এমন মানুষ বোধহয় গোটা উত্তর কলকাতায় নেই। ঠাকুর্দা ব্যারিস্টার, বাবা হাইকোর্টের নামজাদা উকিল, দাদা-ছোটো ভাইও ততখানি প্রতিষ্ঠা না পেলেও ওই লাইনে। আর সুজন? সে মায়ের ইচ্ছায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিল, ওদের মামার বাড়ির তাই ধারা। এখন নামকরা এম. এন. সি-তে সিনিয়ার জি-এম। শাশুড়ির কাছেই শোনা, ছোটোবেলা থেকে পড়া ছাড়া আর কিছু বুঝতনা সুজন। খেলা-ধুলা, আড্ডা থেকে শত হস্ত দূরে, এমনই নিষ্ঠা। আজ তার ছেলে যদি ইলেভেন থেকে টুয়েলভে উঠতে ফেল মারে, ফিটজির টেস্টগুলোতে সমানে পুওর মার্কস পেতে থাকে, তবে তো সে মানুষের হতাশ হওয়াই স্বাভাবিক।

পরমা সুজনের পিঠে হাত রাখল, “কি গো, দুশ্চিন্তা করছ? কি করবে বলো? হ্যাঁ গো, কাল কি বলবে স্কুলে গিয়ে?”

সুজন উত্তর দিচ্ছেনা। মাথা নিচু করে খুটখাট করছে মোবাইলে।

— “কি গো?” পরমা তাড়া দিল।

— “কি আর বলব? আরেকটা সুযোগ চাইব। অনুরোধ করব যাতে ছেলেটার কেরিয়ার নষ্ট না হয়ে যায়”, সুজন উত্তর দিল।

— “হ্যাঁ ভালো করে বুঝিয়ে বলো। তাতে যদি কিছু ডোনেশন-টোনেশন...”

পরমাকে কথা শেষ করতে দিলনা সুজন,

“তুমি লেভ ইয়াসিনকে চেননা না? গর্ডন ব্যাংকসকে?”

পরমা অবাক হয়ে গেল। কারা এরা? সে আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল, “না”।

— “পিলুর স্কুলের প্রিন্সিপালও শোনেনি বোধহয়। কিম্বা শুনেছেন হয়তো, তারপর ভুলে গেছেন আমার মতো।” শোওয়ার আগে নিয়মমাফিক সুজন টয়লেটে ঢুকে যেতে পরমার মনে হল মানুষটা অপমানে বুঝে পাগলই হয়ে গেল।

পিলুদের স্কুলের রিস্পেসনের জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেই একটা কর্পোরেট ফ্রন্টডেস্কের অনুভূতি হয়। আগে ব্যাপারটা একটা সাদামাটা ভাব ছিল, বছর তিনেক আগে পরপর দু’বার বেস্ট স্কুল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর গেটআপে পরিবর্তনটা ঘটেছে। সুজনদের কলেজ স্ট্রিট চত্বরের স্কুলটায় যেমন একটা বড়-সর খোলামেলা ভাব ছিল, তেমনটা নয়, একটা অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য আর মাপা চলাফেরা প্রমাণ করে এ’স্কুলের ডিসিপ্লিন বলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় আছে।

বিনবিনে এ.সি.তে সুজন বসে আছে মিনিট দশেক হয়ে গেল। ফ্রন্টডেস্কের মাঝবয়সী কম হাসির মহিলাটি যথাসাধ্য হেসে জানিয়েছেন যে প্রিন্সিপাল স্যার রিভিউ মিটিং-এ ব্যস্ত। অতএব অপেক্ষা করতে হবে। আশেপাশে সুজনের বয়সী আরও কতকগুলো থমথমে মুখ, বোঝাই যাচ্ছে সব পিলু কেস। দূরের মাঠটা থেকে একটা আলতো হইচই ভেসে আসছে। সুজন একঘেয়েমি আর টেনশন কাটাতে ওদিকে যাওয়ার কথা ভাবল।

পায়ে পায়ে মাঠের ধারে এসে দাঁড়াতেই চমক লাগল। এতটা আশা করেনি তো। দুটো টিম ফুটবল খেলায় মত্ত। আর একটা টিমের গোলপোস্টের নিচে পিলু। গায়ে নাভিক নীল ফুলাহাতা জার্সি। ছেলেটার সতাই লজ্জা-শরম, দায়িত্ববোধ কিছুই নেই, পরমা ঠিকই বলে। ভালো করে জানে আজ কত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ওর জীবনে, কোথায় নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখবে, তা নয়, মাঠে নেমে...। সুজনের ইচ্ছা করল এই মুহূর্তে ছেলেকে ডেকে ঠাসিয়ে এক চড় কসিয়ে দেয়। কাজটা একান্তই অসম্ভব বুঝে নিজেকে সংযত করল সে। পিলু খেয়াল করছেননা তাকে। বিপক্ষের একটা ছেলে বল নিয়ে দুদাড়িয়ে ওদের বক্সের দিকে উঠে আসছে। পিলুর নজর সেই দিকে। বক্সের মাথায় পৌঁছে পা চালালো ছেলেটা।

নিখুঁত পাঞ্চ। বলটা গোলার মত আছড়ে পড়ছে সেকেন্ড পোস্টে, নিশ্চিত গোল। কিন্তু নাঃ, সুজনকে বিস্মিত করে উড়তে শুরু করেছে নীলচে একটা শরীর। বিদ্যুতের বেগে পৌঁছচ্ছে বলের কাছে। দু'মুঠো জড়ো করে একটা ফিস্ট, বল কর্ণার ফ্ল্যাগের একটু আগে দিয়ে সাইডলাইনের ও'ধারে। ব্রিলিয়ান্ট সেভ। অন্য ছেলেরা ছুটে আসছে, পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে পিলুর। আবার খেলা শুরু হবে গেছে। যা বোঝা যাচ্ছে পিলুদের লেফট ব্যাকটা উইক আছে, ঠিকমতো যুঝতে পারছেন। মুহূর্মুহু আক্রমণ আসছে ওখান দিয়ে। সুজন নিজের অজান্তেই খেলায় ডুবে গেল। দারুণ খেলছে পিলু। দারুণ খেলে তো তার ছেলোটো, জানাই ছিল না, ভাবল সুজন। পিলুদের টিমের উপর চাপ খুব, সামাল দিতে-দিতে পিলু অস্থির, তবে সামলেও দিচ্ছে খুব। এই রে! পেনাল্টি! লেফট ব্যাকটা আটকাতে না পেরে বিপক্ষের জার্সি টেনেছে বক্সের ভিতরে। সেই বোমাশট ছেলোটো কিক নেবে। পিলু গোলপোস্টের তলায় দু'হাত ছড়িয়ে পাখির মত দুলাচ্ছে।

হঠাৎ ছেলের চোখ দুটো দেখে অবাক হয়ে গেল সুজন, কোনঠাসা বাঘের মত জ্বলছে। স্থির দৃষ্টিতে সম্মান জ্ঞান আর দায়িত্ববোধ ঝরে পড়ছে। সম্মানজ্ঞান! দায়িত্ববোধ! তাহলে আছে সুজনের ছেলের এ'সব! বড় চেহারার ছেলোটো চকিতে ছুটে এসে বাঁ মোড় মেরেই ডান কোন ঘেঁষে মাটি লোগোয়া জেরে শট নিল। পিলু প্রথমটায় বাঁদিকে টলে গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে উলটো ঝাঁপটা দিল। সুজন অজান্তেই চোখ বন্ধ করে ফেলল। মাঠে খুব হইচই করছে, উল্লাসের শব্দটাকে চোখ খুলে দেখতে সাহস হলনা সুজনের।

— “কেয়া সেভ কিয়া ইয়ে লেড়কা!” আচমকা মন্তব্যে চোখ খুলে সুজন দেখল পাশে রিসেপসনের বুড়ো বেয়ারা দাঁড়ানো। সে মাঠের দিকে চোখ ফেরালো। পিলু বল কোলে হাঁটু মুড়ে বসে আছে, আর একের পর এক শরীর উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওর উপর।

— “সাব, আপ প্রিন্সিপাল সাব কো মিলনেওয়ালে থে না?”

ওহ ফ্রি হ্যায় আভি, ম্যাডাম নে বলি”, বুড়ো ভদ্রলোক খবর দিলেন।

— “ওহ! চলুন”, সুজন ভদ্রলোকের পাশে হাঁটা লাগালো, ভিতরটা থরথরিয়ে কাঁপছে তার।

— “ডিটেনশন কেস হ্যায় ক্যায়া সাব? ইয়ে স্কুল কি না বহুত বামেলাবাজি করতা হ্যায় বাচ্ছাকে সাথ”, বুড়ো ভদ্রলোক আবার বললেন।

— “হ্যাঁ, যে যার নিয়মে চলে আর কি, বুঝলেন না? স্কুল তার নিয়মে চলছে, আবার অন্যরা যে যার নিয়মে। ও'সব পাভা দিয়ে লাভ নেই।” চলুন প্রিন্সিপালকে মিট করে আসি, “সুজন হালকা চালে বলল। বুড়ো ভদ্রলোক বোধহয় কনফিউজড হয়ে গেলেন কিছুটা, আচ্ছা আপকা ফির ওর কুছ কাম হ্যায়। ম্যায়নে শোচা আজ তো সব লোগ ডিটেনশন কে লিয়ে আ রহা হ্যায়। আপভি শায়দ.... আপ ফির কওন হ্যায় সাব?”

সুজন প্রশ্নটায় থমকে দাঁড়াল। স্কুলের দিকে পিছন করে মাঠের দিকে আবার ফিরেছে সে। ডান হাত তুলে একগাল হেসে মাঠের দিকে ইঙ্গিত করে সুজন বলল, “আমি? আমি ওই গোলকিপারের বাবা! ও আমার ছেলে।”

কথা শেষ করে দ্রুতপায়ে রিসেপসনের দিকে আবার হাঁটতে লাগল সুজন। মনে-মনে গুছোতে লাগল কাল করা পিলুর প্রশ্নগুলো। ওই সবক'টা প্রশ্নের উত্তর একে-একে পিলুদের প্রিন্সিপালের থেকে জানতে হবে আজ।



সৌমিত্র চক্রবর্তী — পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার ‘খেলার ছলে’ পত্রিকার মূল কাভারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই ‘দেশ’, শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

রুমঝুম ভট্টাচার্য

রতনের ফেরা

‘ধপাস্’

একটা জোর শব্দে ঘুম ভেঙে তাঁতকে উঠলেন পরমেশ্বর।

কাঁপা গলায় জানতে চাইলেন, ‘কে’ ?

ততোধিক কাঁপা গলায় আওয়াজ এল, ‘আঁজ্ঞে আমি’। গলা শুকিয়ে গেল পরমেশ্বরের। সাহস এনে ভেঙে বললেন, ‘আপনি কে সেটাই তো জানতে চাইছি ? এই মাঝরাতে এখানে কি করতে ?’

‘বাবু আমি রতন’ কঁকিয়ে ওঠে কণ্ঠস্বরের মালিক।

পরমেশ্বর এতক্ষণ বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে ছিলেন। ভয়ে হাতপা অবশ হয়ে গেছে। কুলকুল করে ঘাম হতে লাগল। স্ত্রী মারা গেছে আজ প্রায় আট বছর হল। একমাত্র মেয়ে অন্তরা জামাইয়ের কাজের সুবাদে সুরাটে থাকে। এতদিন চাকর রতন ছিল সঙ্গে। একবছর হল সেও হঠাৎ দুদিনের জ্বরে চলে গেল। মেয়ে বছবার নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছে। পরম রাজী হন নি। তার পক্ষে জামাইবাড়ি গিয়ে বারমাস থাকা সম্ভব নয়। খালি বাড়ি চাবি দিয়ে ফেলে রাখা সম্ভব নয় এই যুক্তি দেখিয়ে মেয়ের প্রস্তাব নাকচ করেছেন। সারাদিন বাসন্তী থাকে। রান্না আর ঘরের সব কাজ সেসে সন্ধ্যা ছ’টা নাগাদ সে বিদায় নেয়। বাসন্তী কাজে ঢুকেছে রতন মারা যাবার পর। সন্ধ্যার পর থেকে পরম একদম একা। এ’ভাবেই চলছে গত এক বছর। রতন চলে যাবার পর থেকে ভয়টা বেশি বেড়ে গেছে। খুব নেওটা ছিল ওনার। পরমেশ্বরের বদলীর চাকরির প্রায় শুরু থেকেই সঙ্গে ছিল। স্ত্রী কমলা মেয়েকে নিয়ে শহরতলির এই বাড়িতেই থাকত। পরমেশ্বরের বাবা মাও থাকতেন সে সময়ে। সে অনেকদিনের কথা। লোকটার কৌকানির আওয়াজে চিন্তিত হন পরম। নিশি টিশি নয়তো ? রতনই কি মায়া ছাড়তে পারছে না ? এতক্ষণে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন বিছানায়। রিটার করেছেন বারো বছর হল। নড়াচড়া করতে গেলে হাড়ে বয়সের ঝুঁকুনি বেজে উঠে জানান দেয় সে কথা। নাইট ল্যাম্পের আলোয় খুঁজতে চেষ্টা করলেন আওয়াজের উৎস। এখনও ক্ষীণ একটা আওয়াজ আসছে।

বিছানা থেকে সাবধানে নেমে সাহস করে আলোটা জ্বালতে এগিয়ে গেলেন। নিজেকে বোঝালেন রতন তার এতদিনের লোক। মরে গেছে তো কি ? সে কি তাঁর ক্ষতি করবে ? আসলে চোর ডাকাতে অত ভয় নেই পরমের। ওদের নিয়েই কাজ ছিল ওনার। সুইচ টিপতেই আলোয় থইথই করে উঠল সমস্ত ঘর। দরজার সামনে একটা রোগা কালো মাঝবয়সী লোক পায়ের গোড়ালি ধরে কাতরাচ্ছে। বোঝা গেল চৌকাঠে চৌকর খেয়ে পড়েছে। এ চেহারা তাঁর চেনা। নেশাখোর ছিচকে চোর। হঠাৎ করে বুকে অসীম সাহস ফিরে এল। হুমকি দিয়ে উঠলেন, ‘বেল্লিক, মাঝরাতে আমার ঘরে কি করছিস ?’ পরম জানেন এদের থেকে নিরীহ জীব ভূভারতে পাওয়া যাবে না। নেশার টাকা জোগাড় করবে বলে রাতের দিকে এর ওর বাড়ি থেকে টুকটাক যা পায় চুরি করে। ভূতের পাশ্চাত্য পড়তে হয় নি ভেবে পরমেশ্বর পরম শান্তি পেলেন। ‘এটু ধরেন’, ককিয়ে বলল লোকটা।

দেখে বোঝা যাচ্ছে পা টা বেকায়দায় পড়ে মচকেছে। কি জ্বালাতন দেখো তো ! এই রাত দুপুরে। ‘এই তুই ঢুকলি কোথা দিয়ে রে। সদর তো বন্ধ।’

‘চোপ, শয়তান’, আধবুড়ো হয়ে গেল এখন চুরি করতে এসে হোঁচট খেয়ে এটু ধরেন... ভেঙে উঠলেন পরম, ‘দাঁড়া পুলিশে ফোন করছি।’ লোকটা নেহাতই নিরীহ চোর। থানার বড়বাবু হওয়ার সুবাদে কর্মজীবনে পরম এমন অনেক



দেখেছেন। এগুলোকে শ্রীঘরে চালান না দিয়ে একটু রগড়ে ছেড়ে দিলে পরবর্তীকালে এদের থেকে অনেক রকম সার্ভিস পাওয়া যায়।

যেমন, গা হাতপা টিপে দেবে, কাপড়চোপড় কেচে দেবে, বাগান করে দেবে, মায় দরকার পড়লে ঝি না এলে বাসনকোসন মেজে গিলিকে সাহায্য করে দেবে। রতনকেও সেভাবেই পাওয়া।

‘কি নেশা করিস?’

মাথা নাড়াতে নাড়াতে অ্যাভো বড় জিভ কাটল চোরটা। ‘নাগো, মাইয়ার বড়...’ ‘থাক, আর গাঁজা-গম্বো দিতে হবে না’, ধমক দিলেন পরমেশ্বর।

‘বাবু এবারের মতো ছেড়ে দিন। আর হবে না। পুলিশ ডাকবেন না,’ লোকটা ককিয়ে উঠল। ‘অ, তাই নাকি? তবে চুরি করে চুপচাপ পালাতে পারিস নি? মাঝরাতে আমার ঘুমটা ভাঙতে কে বলেছিল?’ এবার চোর গলা চড়াল। ‘আরে, তাই তো যাচ্ছিলাম। বাবাঃ যা চাঁচালেন। বলতে লাগলেন ‘রতন, তোকে আমি ছাড়ব না’... আমার তো আআরাম খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড়। পড়িমরি দৌড়াতে গিয়েই তো হেই কান্ড।’ ‘দোষ আমার না আপনার?’ উল্টো চাপ খেয়ে পরম একটু দমে গেলেন। ঘুমের মধ্যে কথা বলার অভ্যাসটা তাঁর অনেকদিনের বটে। কমলাও বিয়ের প্রথম প্রথম ভয় পেত। পরে অবশ্য তার গা সওয়া হয়ে গেছিল। চোরও ছিঁচকেমিতে ওস্তাদ। সুযোগ দেখে বলে উঠল, ‘কেন মেসোমশাই, ঘুমের মধ্যে কেউ এত চাঁচায়?’ ‘আই মেসোমশাই কাকে বলছিঁস রে। আমি তোর মেসোমশাই...?’ চোর বুঝল ভুল খেলে ফেলেছে। আমতা আমতা করে ম্যানেজ দেবার চেষ্টা করল, ‘না, মানে বাবু ভুল হয়ে গেছে। এবারের মতো ছেড়ে দিন।’ পরমেশ্বর মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেন। যাক, মাঝরাতে ভূতের পাল্লায় পড়তে হয় নি। হাত ধরে ওকে তুলে দাঁড় করালেন। ‘কিরে ভাঙেনি তো?’

রতন খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারল। ‘নাহ, এটু ব্যথা লাগছে।’ ‘বোস্ এখানে।’ একটা টুল এগিয়ে দিলেন, পরম। ‘এ নে জল খা।’ জলের বোতলখানাও এগিয়ে দিলেন।

রতনকে এবার ভাল করে দেখতে লাগলেন পরমেশ্বর। গায়ে একটা রঙচটা টি শার্ট আর পরণে ঢোলা হাফ প্যান্ট। মাথার মথিখানে চুল উঠে অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গেছে। ‘এ লাইনে কতদিন?’ জানতে চাইলেন। রতন এখন একটু স্বস্তি পেয়েছে। মনের ভয়টাও কেটেছে অনেকটা। এ বাবুটা মন্দ নয়। বেশ একটা রসিক মেজাজ আছে। সবথেকে বড় কথা রতন যে কি চুরি করেছে জানার কৌতুহল নেই মোটে। ‘আজ্ঞে খুব বেশিদিন নয়’, রতন মিহি গলায় জবাব দেয়। ‘তা আগে কি করতিস?’ পরম শুধান। ‘পকেট মারতাম, বাবু। যা রোজগার হত নেশাতেই... মাঝপথে থামান পরম, ‘এখন আর মারিস না?’ ‘নাহ, খদ্দের পাই না’, হতাশ গলায় বলল রতন। ‘একটা কথা বলব মনে নেবেন না?’ প্রশ্নটা করে উৎসুক চোখে তাকাল পরমেশ্বরের দিকে। তার পর গড়গড় করে বলতেই লাগল... ‘আজকাল ওই সব ডিজিটাল ইন্ডিয়া না কিসব হয়ে না চুরির লাইনেও খুব মন্দা।’ পরমেশ্বর হেঁচকি তোলেন। বলে কি রে লোকটা। ‘দেকুন বাবু, পকেটমারদের অবস্থাও খারাপ। পকেট কেটে পাবে কি? ক্যাশ তো কিছু নেই। খালি চাড্ডি কার্ড। সেসব কার্ডে কি সব নম্বর টম্বর লাগে। তা নিয়ে আমার মত মুখুরা কি করে বলুন দেখি। লোকের বাড়ি সিঁধ কাটলেও সেই দশা। কারো কাছে আর কাগজের টাকা নেই। কাগজে কলমে টাকা আছে। ক্যাশলেশ না পিভি কি সব...’ রতনের হতাশা ধরতে পারেন পরম। সত্যি তো। পরমেশ্বরকেই কি কম নাকাল হতে হয়। এই বয়সে অনেক কসরত করে কার্ড দিয়ে টাকা তোলা শিখেছেন। বড়বাবু থাকা অবস্থায় কাঁচা টাকা ঘরে গজগজ করত। এখন দরকার মত মাসে এক দুবার টাকা তুলে নেন। রতন বকবক করতে থাকে, ‘চোর হতে গেলেও এখন পেটে একটু বিদ্যে লাগবে। এখন তো সব কার্ডে কার্ডে চুরি হয়ে যাচ্ছে।’ হেসে ফেলেন পরমেশ্বর। বেশ লাগছে চোরের সাথে বসে বসে খোশগল্প করতে। সেদিন খবরের কাগজে পড়ছিলেন বটে ডিজিটাল পিকপকেটের কথা। ডিজিটাল চোরদের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে সনাতন চোররা বেশ কোণঠাসা বোঝা গেল।

জানলার বাইরে আবছা আলোর আভাস। ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। লোকটাকে পুলিশের হাতে দিলে পিটিয়ে মেরে ফেলবে হয়তো।

রতনের ওপর মায়া হল। সেভাবে দেখলে তিনিও চৌর্যবৃত্তি কম করেন নি। বাবার সিগারেট চুরি করেন নি? মার ঝাঁপি থেকে খুচরো পয়সা নিয়ে সিনেমা দেখেন নি? আর বড়বাবু থাকাকালীন...

পরমেশ্বর জানতে চাইলেন না রতন কি চুরি করতে এসেছিল। দেরাজের চাবি তো পরমেশ্বরের বালিশের নীচে থাকে। টাকাপয়সা নিতে পারেনি কিছু। বাড়ি ভর্তি জিনিসের অধিকাংশই আজ তাঁর জীবনে অপ্রয়োজনীয়। একাকিত্বটাও অতিরিক্ত হয়ে গেছে স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে। রতন যাবার পর থেকে আরও বেশি করে। রোজ রাতে রতনের ভয়ে সিটিয়ে থাকতে হয়। এককালীন থানার দুঁদে বড়বাবু ভূতের ভর পান এই লজ্জা লুকিয়ে রেখে জানতে চাইলেন, ‘কাজ করবি?’

রতন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল পরমেশ্বরের দিকে।



রুমঝুম ভট্টাচার্য পেশায় মনোবিদ। তাঁর পেশা চর্চার মধ্যে সামাজিক সচেতনতা ফুটে থাকে সর্বক্ষণ। স্বাস্থ্য আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক রুমঝুম তাঁর শক্তিশালী কলমকে মূলতঃ পেশাগত লেখালেখির ক্ষেত্রে ইদানীং ব্যবহার করলেও সাহিত্যচর্চাও করে থাকেন নিয়মিত। নানা সংবাদপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধই তার প্রমাণ। এই প্রথম কলম ধরলেন বাতায়নের জন্য।

সুদীপ্ত ভৌমিক

আমেরিকায় বাংলা নাটকের নব জাগরণ

কিছুদিন আগে ইউ টিউবে একটা বিতর্ক শুনলাম। বিষয় ছিল, “বাংলা ভাষার পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে”। পক্ষে এবং বিপক্ষে বক্তব্য রাখলেন বেশ কিছু বিদ্বজন। যারা পক্ষে বলছিলেন তাঁদের বক্তব্য, ইংরেজি এবং হিন্দির চাপে বাংলা ভাষার নাভিশ্বাস উঠে গেছে। আর বেশিদিন আয়ু নেই তার। যারা বিপক্ষে বললেন, তাঁদের মতে বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যত মানুষ বাংলা ভাষা বলেন এবং চর্চা করেন, তার সংখ্যার জোরেই এই ভাষা টিকে থাকবে চিরকাল। প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকার কথাও উঠল বেশ কয়েকবার। প্রবাসী বাঙালীর বাংলা চর্চার প্রতি কিছু মানুষ যে শ্রদ্ধা রাখছেন, তাঁদের গুণ্ঠির মধ্যে রাখছেন, এই বিতর্ক আমাকে হঠাৎ সে বিষয়ে সচেতন করে তুলল। নয় নয় করে প্রায় তিন দশক কাটিয়ে দিলাম এই প্রবাসে। চিরকাল দেখে এসেছি প্রবাসের বাংলা চর্চার প্রতি কলকাতার বিদ্বজনেরা একধরনের তাক্ষিল্য প্রকাশ করে আসছেন। আজ হঠাৎ তাঁদের মনে হয়েছে, বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রবাসী বাঙালীদের অবদানেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। অন্তত এই বিতর্ক সভায় যারা বিষয়ের বিপক্ষে বললেন, তাঁদের কথা শুনে সে রকমই মনে হল।

না, আমি বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করব বলে বসিনি। আমি একজন সামান্য নাট্য কর্মী। আমেরিকায় বসে বাংলা নাটকের চর্চা করি। আর সেই বাংলা নাটকের মধ্যে দিয়েই আমার বাংলা ভাষা চর্চা। শুধু আমি নই, আমার মত আরও অনেক মানুষ আজ আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা ভাষায় নাট্য চর্চা করছেন। সেই চর্চার জন্যই আজ আমাদের প্রবাসের বাংলা থিয়েটার এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে দেশের মানুষও নড়েচড়ে বসছেন এবং আমাদের কিছুটা স্বীকৃতি দিচ্ছেন। অবশ্য প্রবাসে বাংলা ভাষার চর্চার অন্যান্য অনেক দিকও রয়েছে — সাহিত্য চর্চা তার অন্যতম। কিন্তু আজ আমি কেবল নাট্য চর্চাতেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

বাঙালীদের সম্পর্কে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে তিন জন বাঙালী একত্র হলেই একটা নাটকের দল তৈরী হয়। প্রবাসে বাঙালীর নাট্য চর্চা সেই পথেই এগিয়েছে। আর এই নাট্য চর্চা কেবল অবসরে সময় কাটাবার জন্যই নয়, নাটকের হাত ধরে দেশে ফেলে আসা দিন গুলোকে ফিরে পাওয়ার এক অন্যতম পথ। নস্টালজিয়া ছিল এই থিয়েটারের প্রধান আকর্ষণ। দেশে যে সমস্ত নাটক আমাদের মুগ্ধ করত, সেই নাটক গুলোরই পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করতাম আমরা। প্রযোজনার মান খুব উন্নত না হলেও, অভিনেতা-অভিনেত্রী-কলাকুশলী-দর্শক সবাই মিলে হইহই করে একটা দারুণ উপভোগ্য ব্যাপার হত। সারা সপ্তাহের খাটুনির পর, নাটকের রিহাসালে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচত সবাই। অভিনয়, নির্দেশনা ইত্যাদি ব্যাপারে তেমন খুব একটা অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ না থাকলেও কেবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়েই প্রযোজনা দাঁড়িয়ে যেত। আর একজন দুজন প্রতিভাধর শিল্পী প্রায় সব দলেই পাওয়া যেত, যারা কেবল নিজেরাই ভাল কাজ করতেন তা নয়, অনেককে গড়ে পিঠে তৈরি করে নিতেও জানতেন। “ব্যাপিকা বিদায়”, “বৌদির বিয়ে”, “কেনারাম বেচারাম”, “ছুটির ফাঁদে” এর মত মজার নাটক ছাড়াও, “ফেরারি ফৌজ”, “বাকি ইতিহাস”, “এবং ইন্দ্রজিত” এর মত সিরিয়াস নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে।

কিন্তু ক্রমশ যখন এদেশে বাঙালীর সংখ্যা বাড়তে লাগল, কিছু কিছু এমন মানুষও এসে পড়লেন যারা দেশে গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিছু ভাল কাজ দেখেছেন, গুণী জনের কাছে কাজ শিখেছেন। এই তথাকথিত “সখের” থিয়েটারে তাঁদের মন ভরছিল না। তারা চাইলেন এমন কিছু কাজ করতে যা মানুষকে বিনোদনের চাইতেও বেশি কিছু দেবে। তারপর যখন তারা ব্রডওয়ে, অফ-ব্রডওয়ে, অফ-অফ-ব্রডওয়ের থিয়েটার দেখলেন, তাদের মন অস্থির হয়ে উঠল। তারা শুরু করলেন উন্নত মানের থিয়েটার যা বিষয় বস্তুর গুরুত্ব, অভিনয়ের সৌকর্যে, প্রযোজনার নৈপুণ্যে কলকাতার

থিয়েটারকে পাল্লা দিতে পারে। আশি-নব্বইয়ের দশকে নিউ-জার্সি নিউইয়র্কের মধ্যে বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রখ্যাত নাট্যকারদের সিরিয়াস নাটক গুলো মঞ্চস্থ হতে লাগল। আগে বেশির ভাগ বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হত পুজো পার্বণের মধ্যে। কিন্তু এই নাট্য কর্মীরা তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা তাদের নাটক কেবল নাট্যমোদী দর্শকদের জন্য, আলাদা করে মঞ্চস্থ করতে চাইলেন। যেখানে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, মঞ্চ, আলো, শব্দ পরিকল্পনা – অর্থাৎ একটা ভাল থিয়েটার উপস্থাপিত করতে যা লাগে তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দর্শকদের প্রকৃত ভাল নাটকের স্বাদ দিতে পারবেন। এবং বহুলাংশে সফলও হলেন। শুরু হল আমেরিকায় বাংলা থিয়েটারের নব জাগরণ। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি অঞ্চলে মনোজ ভৌমিক, শক্তি সেনগুপ্ত, শঙ্কর ঘোষাল, দীপন রায়, গৌতম দত্ত, তরুণ চ্যাটার্জী এই আন্দোলনের হাল ধরলেন। শক্তি সেনগুপ্ত তৈরি করলেন তার দল সংশপ্তক। মঞ্চস্থ করলেন কাফকা অনুপ্রাণিত নাটক বিকার। তারপরে করলেন নিজের লেখা নাটক “শব্দ মোহ বন্ধনে” – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প, সুনীল শক্তির কবিতা থেকে রচিত সেই নাটক। এই নাটকের মাধ্যমেই আমার পরিচয় শক্তিদার সঙ্গে। তরুণ চ্যাটার্জী, কল্যাণ রায়, গৌতম দত্ত, নির্মল রায় মিলে করলেন তাদের দল AIAC (Association for Indian Arts and Cultural)। প্রয়োজনা করলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে নাটক – “গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প।” নাট্য রূপ ও নির্দেশনা গৌতম দত্ত। পরবর্তী কালে গৌতম করলেন “একাকী অঙ্গন” এবং তার ইংরেজি রূপান্তর “Anjan Alone”। তার কিছুদিন বাদে শ্রী শম্ভু মিত্রের নাটক “চাঁদ বনিকের পালা” মঞ্চস্থ হল নির্মল রায়ের নির্দেশনায়। অন্যদিকে দীপন রায় নিউ ইয়র্কে গড়লেন তার দল এপিক এক্টরস ওয়ার্কশপ। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে “নুরালদিনের সারা জীবন” এপিকের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনা। এর পরে এপিক এক্টরস ওয়ার্কশপ একটি বিশেষ ধারা চালু করলেন। দেশ থেকে অভিজ্ঞ এবং সুখ্যাত পরিচালকদের এদেশে আমন্ত্রিত করে, তাদের নির্দেশনায় প্রয়োজনা করলেন একের পর এক মঞ্চ সফল নাটক। এলেন বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, উষা গাঙ্গুলি, অমল পালেকারের মত প্রতিভাশালী নাট্য নির্দেশকরা। আর তাদের সঙ্গে কাজ করে এপিকের কলা কুশলীরা শিখলেন অভিনয়ের নানান দিক, শিখলেন নির্দেশনার সূক্ষ্ম মার প্যাচ। দর্শক দেখলেন আমেরিকার মঞ্চ কিভাবে কলকাতার একাডেমী মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে। সেই একই মানের প্রয়োজনা দেখে কলকাতার ফেলে আসা জীবনকে ফিরে পেলেন তারা।

কিন্তু তবু কিছু মানুষের খিদে তাতেও মিটল না। আমি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমার কেবলই মনে হত, এতবছর এদেশে থাকার পড়, আমাদের নিজেদের গল্প কি আমরা বলতে পারিনা? কেন আমাদের কলকাতার সেই পুরনো নাটক বার বার মঞ্চস্থ করতে হবে? থিয়েটার ওয়ার্কশপের কর্ণধার শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করলেন। বললেন, “তোমাদের নিজেদের থিয়েটার তোমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি করতে হবে।” সেই তাগিদ থেকেই আমার নাটক লেখা। “ফেরা”, “রণ”, “কালশুদ্ধি”, “টেকনিক পার্ক ওয়ে”, “সত্যমেব”, “পালক” ইত্যাদি নাটক আমাদের জীবনের কথা, আমাদের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশার, আমাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের গল্প বলে। দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকে আমাদের নিজেদের যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, সেই সংস্কৃতি দেশের বাঙ্গালীর সংস্কৃতি থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। তাই দেশের মানুষ যখন আমাদের নাটক দেখেন, তাঁরা এক নতুন বাঙ্গালী সমাজের ছবি দেখতে পান, যারা তাঁদের মত হয়েও কোথায় যেন একটু অন্যরকম। আর এই অবসরে, বহু বছরের প্রথা ভেঙে, প্রবাসের বাংলা নাটক উল্টো পথে পাড়ি দিল দেশে। স্থান পেল দেশের মধ্যে। কলকাতার দামীদামী দল প্রয়োজনা করলেন আমেরিকার বাংলা নাটক – “সত্যমেব”, “টেকনিক পার্ক ওয়ে”, “ফেরা”, “পালক”। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়ে মঞ্চস্থ হল চেন্নাই, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, আহমেদাবাদে। বলা যায়, এই প্রথম প্রবাসের নাটক দেশের নাট্য রসিক সিরিয়াসলি এবং আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

এই পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় সব বাংলা থিয়েটারের দল নিজেদের নতুন করে উদ্ভাবন করতে শুরু করলেন। কলকাতার নাটকের উপর নির্ভর না করে থেকে নিজেদের তৈরি নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন। নিউ জার্সিতে আমার দল একতা ছাড়াও, এপিক এক্টরস, সারা রাত্তির ইত্যাদি দলগুলি উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটক মঞ্চস্থ করতে শুরু করলেন। পাশের রাজ্য ডেলাওয়ারে উডান নাটকের দল বেশ কয়েকবছর ধরে ভাল কাজ করছেন। এখন ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর ও দক্ষিণের দলগুলি নিজেদের নাটক, অথবা অন্যান্য প্রবাসী নাট্যকারের নাটক

নিয়মিত মঞ্চস্থ করেন। লস এঞ্জেলসে মদন গোপাল মুখোপাধ্যায়, স্যান ফ্রান্সিস্কোয়ে রাজ রায় নাট্যকার হিসেবে বাহবা পেয়েছেন। সিয়াটলে বৃশ্চিক, সিয়াটেল থিয়েটারওয়াল, এবং এষ্টন উন্নত মানের নাটক পরিবেশন করে চলেছেন। বৃশ্চিকের দেবব্রত দে নাট্যকার হিসেবেও নিজের পরিচয় সুদৃঢ় করেছেন। মেরিল্যান্ডে দিব্যেন্দু পাল মৌলিক নাটক রচনা এবং নির্দেশনায় নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখেছেন। শিকাগোর শিকাগো নাট্যগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক কালের প্রযোজনাগুলি দর্শকের প্রশংসা পেয়েছে। মিশিগানে ডেট্রয়েটের পাশের শহর এন আরবরের নাট্যকার বিশ্বদীপ চক্রবর্তী ও নির্দেশক মালা চক্রবর্তীর দল মিলিটস বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা মঞ্চস্থ করেছেন। সাউথ ক্যারোলিনাতে নাট্যকার নির্দেশক কৌশিক সেন নিয়মিত নাট্যচর্চা করে চলেছেন। হিউস্টনে মিস্ট গোষ্ঠী (পার্থ সেন, মানস সাহা) বেশ কয়েক বছর ধরে মননশীল নাটক উপহার দিয়ে চলেছেন। সেখানে আরও কিছু ছোট বড় দল নাট্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত। এটল্যান্টা থিয়েটার ওয়ার্কশপ দক্ষিণের রাজ্য গুলির মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত দল, এবং দীর্ঘদিন ধরে তারা ভাল কাজ করছেন। ওহায়োর কলম্বাস শহর ইদানীং বাংলা থিয়েটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। প্রবীর বসু তরুণ চ্যাটার্জী, কৌশিক মজুমদার এবং তাঁদের সহযোদ্ধাদের উৎসাহে একাধিক নাট্য দল বাংলা নাটকের চর্চা করে চলেছেন। অন্য থিয়েটার, স্পটলাইটের মত দলগুলি কলকাতার বিশিষ্ট নির্দেশকদের আমন্ত্রিত করে তাঁদের পরিচালনায় নাটক প্রযোজনা করছেন।

মেঘনাদ ভট্টাচার্য, উষা গাঙ্গুলি, দেবশঙ্কর হালদার, সৌমিত্র বসুর মত নামীদামী পরিচালকরা তাঁদের মঞ্চ সফল নাটকগুলি কলম্বাসের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে মঞ্চস্থ করেছেন। সন্দীপ মজুমদার নাট্যকার হিসেবেও নিজের পরিচিতি রেখেছেন।

নিজেদের নাটক মঞ্চস্থ করা ছাড়াও উত্তর আমেরিকার দলগুলি নাট্য চর্চার বড় সুযোগ করে দেয় বিভিন্ন শহরে আয়োজিত নাট্যোৎসব এবং নাট্য মেলা। দীর্ঘ তের বছর ধরে এপিক এন্টরস ওয়ার্কশপ নিউ জার্সিতে সাউথ এশিয়ান ফেস্টিভাল আয়োজন করে আসছেন। এই উৎসবে কেবল বাংলা নাটক নয়, অন্যান্য দক্ষিণ এশিয় ভাষাতেও নাটক মঞ্চস্থ হয়। হিউস্টন, সিয়াটেল, কলম্বাস, ডেট্রয়েট, ক্যালিফোর্নিয়া – বাংলা নাট্য চর্চার প্রায় কেন্দ্রেই নাট্যোৎসব আয়োজিত হয়। আসে পাশের শহর রাজ্য থেকে দলগুলি এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে পরস্পরের মধ্যে নাট্য ভাবনার আদানপ্রদান করে নিতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়া বে-এরিয়ায় সংস্কৃতি গোষ্ঠী এগারো বছর ধরে নাট্য মেলা আয়োজন করে চলেছেন। ডেট্রয়েটে মিলিটস গোষ্ঠী গত দু বছর ধরে একটি সফল নাট্য উৎসব আয়োজন করছেন। হিউস্টন দুর্গা বাড়িতে বহুবছর ধরে একাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা হয়ে চলেছে।

প্রতি বছর আয়োজিত উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন প্রবাসী বাঙ্গালীর সর্ব বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাট্য প্রযোজনার সঠিক পরিকাঠামো না থাকলেও একাধিক নাট্যদল এই সম্মেলনে তাঁদের নাটক মঞ্চস্থ করেন। বঙ্গ সম্মেলনে অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানের মাঝে বাংলা নাটক অনেক সময় হারিয়ে গেলেও, কিছু দর্শক অধীর আগ্রহে বসে থাকেন সেই থিয়েটার দেখবার আসায়। একসঙ্গে হাজার পাঁচেক দর্শক পাওয়ার সুযোগ তো সব সময় ঘটে না।

এক কথায়, উত্তর আমেরিকায় বাংলা থিয়েটার বেশ রমরমিয়েই চলেছে। সবচেয়ে সুখের বিষয় যে, প্রবাসী বাঙ্গালীর থিয়েটার এখন বাংলা সংস্কৃতির এক অন্যতম অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আশা রাখব ভবিষ্যতে আমাদের নাটক আরও উন্নত হবে, বিশ্বের দরবার তার স্থান করে নেবে।

পুনশ্চঃ অনেক নাট্য দল, অনেক বিশিষ্ট নাট্য কর্মীদের নাম হয়ত বাদ পড়ে গেল, সে জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি।

সেতুবন্ধন, জানুয়ারী ২০১৯

বাংলা সাহিত্যের তীর্থভূমিতে নিরন্তর সৃষ্টি হয়ে চলেছে কিছু অসাধারণ সাহিত্য, আবির্ভাব হচ্ছে বহু শক্তিশালী লেখকের। সেই সমস্ত নতুন নতুন সৃষ্টির সঙ্গে প্রবাসী পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই বাতায়নের “সেতুবন্ধন”।

বিভাগটির দ্বায়িত্বে আছেন মানস ঘোষ (বাতায়ন/কোলকাতা)।

আপনাদের মতামত বা নতুন বই পড়ে পাঠপ্রতিক্রিয়া/সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠানোর অনুরোধ রইল, নিচের ঠিকানায় –
mailtomanas2014@gmail.com

গ্রন্থ পরিচিতি:

শ্রীশ্রী অনুপূর্ণা ভাণ্ডার – যশোধরা রায়চৌধুরী, প্রকাশক – ছোঁয়া।

দুদিকের জানলা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো বেথুন কলেজের সামনে। ঘোষ পরিবারের বধূর কলেজে পড়া শুরু হল। গত শতাব্দীর বিশের দশকের কথা। এ ছাত্রীই হলেন লেখিকার প্রিয় দিদু।

তারপরেই চলে আসুন আশির দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজের গল্লে যেখানে সিনে ক্লাব গড়ে, গোদার, বার্গম্যান, ফেলিনি দেখার অভিজ্ঞতা, অথবা লেখিকার ছোটবেলায় দেখা হরিনঘাটা দুধের ডিপোর স্নানমুখ মেয়েদের কথা।

যেন টাইম মেশিন। নিমেষে ঘুরে আসা যাবে, বিশের দশক থেকে সত্তর আশি ছুঁয়ে প্রায় হাল আমলের খুঁটিনাটিতে। স্মৃতির ডানায় ভর করে এ এক আশ্চর্য উড়ান। বেড়ালযাপন থেকে বসন্তের স্বাদবদল, মা ও দিদার বিদ্যাচর্চা আর জীবনসংগ্রাম থেকে সেলাইকলের সঙ্গীত, এক অসামান্য যত্ন ও মমতার সাথে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের স্মৃতি নিয়ে নানা রঙে, হাসি কান্না সুস্বাদু সূতোয় বোনা এই নকশিকাঁথা যেন কারো ব্যক্তিগত জীবনের গল্প নয়, এমন এক উপাখ্যান, যা ইতিহাস বইতে লেখা থাকবেনা, অথচ আমাদের মত বহু মানুষের গড়ে ওঠার সময়ের এক অন্তরঙ্গ দলিল।

মোবাইল পূর্ববর্তী সময় ও আরো আগে যাদের বাল্যকাল কেটেছে, তারা পড়তে পড়তে বারবারই নিজেদের জীবনস্মৃতির সঙ্গে মিল পাবেন। (সম্ভবত এই কারনেই, কয়েকমাস আগে প্রকাশ হলেও বইটির চাহিদা এখনো অত্যন্ত বেশী।)

কাঁচের বোয়ামে ছিল
যাবতীয় . . . প্রাচীন আচার।
রোদে দিই, তুলে এনে রাখি,
স্মৃতির টাকনায় স্বাদু হয়ে ওঠে,
থোড় বড়ি যাপন
. . . রোজকার।



Editorial

It's time for a new year and a new edition of *Batayan*. The English pieces in this issue follow the theme of struggle: old vs. new, near vs. far and especially making the everyday life meaningful.

In *How Peace Works* Kathy Powers celebrates the hard work of peacemakers. M.C. Rydel examines artists' effort for perfection in *Blurred Edges*. A flower blooms on the face of a barren gray cliff. Maureen Peifer remembers the sweet, scary and sincere moments of childhood in *Friday Afternoon*. Two siblings make the effort to stay together despite time and distance in *A Sister's Pride*.

We hope you can enjoy and relate to these works. Let art remind you that we are never alone in our journey.

Thank you for reading *Batayan*!

Jill Charles
Batayan English Editor

PS We are looking for more reviews of books, films and restaurants.



Susan Koenig

Amber

Catch the light and play
Once live droplet of primordial day.
Cold crucibles of pressure and held time
have forced this tear from ooze and pitch
and slime
What separates that slight prehensile paw
that touched your bubbly fragrance, pine-
scent raw
from my smooth fingered grasp that cups warm stone?
What brothers are we then, beneath the bone?
Deep honeyed light refracts to bridge the day,
Igniting each, a shining slanted ray.





M.C. Rydel

Blurred Edges

The experts use photoshop to eliminate
Every trace of imperfection,
Erase a cowlick, hide the wrinkles,
Snip a jowl, touch up the eyes.
What's left is magazine perfection,
Which is really no perfection at all.

I find beauty in subtle imperfection:
A cathedral's tilted rose window,
Spilt tea when the in-laws come over,
The moon obscured by tree tops
And that deliberate flaw in a Persian rug,
Because only Allah can achieve perfection.

I am no expert, barely competent with my phone;
I take photographs with blurred edges,
Unintentionally, ring a bell at midnight,
Burn incense in hallucinogenic tents,
Sleep like a tonsured monk on a donkey
Leading everyone else in the dream, astray.

Dreams have a special imperfection.
The backup singers are a little off key.
Cities in the clouds sway in the wind.
People who you've known your whole life,
People who seen only once on a subway
Follow you like a procession of sins.

I have discovered a way to take photos
Inside my dreams and sell them for a profit.
What makes them authentic are the blemishes,
Nine and a half by eleven paper,
Foie gras and baguettes with the wrong wine
Erotic books, secret looks, and forbidden drawings.

Flawed beauty and remembered truths,
Like the melancholy sense of the bittersweet are,
Withered and lean, aging with grace,
A broken seashell on a Florida beach,
The singed humanity burnt off in Purgatory
Before the doors of Eden get to open.

Yes, I know religion is all made up.
Like little mistakes transcribed into braille,
It is the exquisite fabrication of imperfection.



Kathy Powers

How Peace Works

All hail to the peacemakers:

Their presence so strong.

Their outreach encourages

Wise sense in our throng.

The schools for the peacemakers:

Utterly serene

Universal, inclusive,

Structurally clean.

We get from the peacemakers:

Goodwill, synchronized,

Harmony, tranquility

Composed, equitized.

We give to the peacemakers:

Agreed assurance

Unity, purposeful oaths

Pledge reassurance.

We all become peacemakers:

Enduringly kind.

Evolved, inevitable

A product of mind.

Kathy Powers — I am a civil rights activist and developed my passions from coping with bipolar disorder symptoms. I have a tagline: "Advocacy is my therapy." Through advocacy I have discovered truth and beauty in helping people and sharing art.



Maureen Peifer

Friday Afternoon

Friday afternoons, we third graders file into church at 2:30 just before dismissal for our weekly confessions. The soaring Gothic stone of Saint Gertrude's, its tall brown heavy arched doors inspire, no demand, our silence.

"Think about what you've done as you walk boys and girls. Examine your conscience and think about what you've done to hurt our Lord and what you will do to be better next week," intones Sister Mary Viola, our third grade teacher. Though not much bigger than many of us she speaks as with the voice of God in my 8 year old brain.

We file solemnly and silently into the smooth worn marble floored church, each stopping to dip two fingers into the holy water font and bless ourselves as we've been taught. We fill in two pews across, Sister Viola's class to the left near Father Mulcahy's confessional, Sister Mary St. Ambrose's class to the right by Monsignor Kelly.

I'm so glad we get the young Father Mulcahy - he doesn't make you so scared. Monsignor Kelly seems to delight in intoning the wrath of God, sometimes loud enough to be heard outside the confessional. "You did what young man ? For shame ! " He also gives big penance- decades of the rosary, not just Our Fathers and Hail Marys like Father Mulcahy.

Each ornate wooden confessional has a tall center section with the comfy priest chair inside and an outside light to let you know that father is " in ". On either side is a smaller door containing a kneeler which faces a covered carved wooden screen which can be slid back when it is your turn. You can't really see the priest, just a blackish outline leaning close to the screen to hear you as you whisper in the dark.

"Bless me Father for I have sinned. It has been one week since my last confession. I was disobedient to my mother 3 times. I tricked my brother twice. And I lied about washing out the tub after my bath. For all my sins I am heartily sorry and promise to do better in the future."

"Did your mother have to wash the tub since you had not?" asked Father Mulcahy.

"Yes," I whisper, even lower.

"Can you see how hard your mother works to take care of you and how God expects us all to do our share?"

"Yes, Father," I sniffle.

"Do better next week. Say 5 Our Fathers and 5 Hail Marys and do an extra favor for your mother. The blessing of God be upon you."

"Thank you Father."

As I file back to the long polished oak pew and kneel to say my penance, I look up at the tall arched stained glass window and see Archangel Michael smile right at me. I know I will do better next week.



Smoothing my navy blue jumper, I sit and wait to walk out with my class into the warm Autumn sun and think about how I will spend the dime nestled in my Buster Brown saddle shoes. We always stop at the corner store, Kelly's, on the way home on Friday afternoons.

Kelly's is set back from the corner of Granville and Green view just west of St. Gertrude's. There are painted faded pop signs along the top and bottom of the slightly dingy plate glass windows - signs for Coca-Cola, RC, Dr. Pepper. The dark green frames have slightly bubbled paint that you know would peel sometime soon. The bell on the door jingles every time one of us goes in or out. Mrs. Kelly only allows eight children at a time in the store. She stands - short, squat, red-faced and haired smiling at each of us while we look through the slanted glass display case and carefully peruse our choices of penny candies: wax lips, teeth, mustaches, bulls eyes, 3 for a penny, 3 packs of wax bottles full of some brightly colored disgusting syrup, licorice whips, peppermint sticks, lemon drops, 3 for a penny, sheets of dots.

Then there were the more expensive choices - Mars Bars and Almond Joy, a nickel each, Hershey bars 3 cent or 5 cent size, bottles of delicious chocolate Kayo in the ancient cooler, 7 cents each (you got a 2 cent deposit back). Mr. Kelly is in charge of the cooler. Finally, the decadent Twinkies, Snowballs, and Hostess Cupcakes nestled in their cellophane wrappers, begging you to spend your whole dime on them.

The choice is hard- sometimes you have to think about it all Friday afternoon, except during confession of course.

"I'll take a Kayo, 3 bulls eyes, wax lips, and 3 lemon drops, please Mrs. Kelly

She dutifully drops each item into a tiny brown bag while Mr. Kelly pops the top on the Kayo for you.

"See you next week dear".

Ah, the joy of a clean soul and a sweet reward.



Maureen Peifer is a Chicagoan with a lifelong love of literature, writing, travel, and teaching. She is currently the school librarian at a Montessori school where she previously taught. Her summers are spent in Amsterdam, which inspired this poem.



Jill Charles

Mary, Queen of Scots — Film Review

Most students of European history know that in 1587 Queen Elizabeth I of England had her own cousin, Mary Queen of Scots, executed. There was a Catholic conspiracy to kill Elizabeth and crown Mary as monarch of England and Scotland, but evidence of Mary's involvement is still questioned by scholars today. Few know the story of how the two cousins grew up separately, raised as rivals, yet often showed more care and respect for each other than their male advisors and subjects showed for them.

Directed by Josie Rourke the 2018 film *Mary, Queen of Scots* looks history directly in the eye from the viewpoints of Mary (Saoirse Ronan) and Elizabeth (Margot Robbie) leading parallel lives in rival kingdoms on the same British Isle, each hoping for peace yet afraid of being deposed. Both actresses show the queens' struggles, hopes and fears in every line and every scene. I learned many nuances of history that my history books never mentioned from the letters between the two queens in which Elizabeth tried to find an English husband for Mary and Mary's requests to be Elizabeth's heir.

Mary's half-brother James opposes her Catholicism and alternately protects and plots against her to maintain his own power in the Scottish court. Both Mary and Elizabeth begin their reigns with an attempt at religious tolerance of both Protestants and Catholics. Yet Mary is bitterly condemned as a decadent Catholic by Protestant enemies raising troops against her and Elizabeth faces opposition from Spain and the papacy who would depose her for being an Anglican. Each queen is confronted, again and again by enemies from the preacher John Knox who claims that no woman can ever rule over men to hired assassins and false lovers.

Is it braver to abstain from marriage and male domination as Elizabeth does or to boldly marry for love and conceive an heir for the nation as Mary does? It shocked me to see the lower ranking nobleman try to seize control of Scotland by marrying Mary. After a rebellion in Scotland, Elizabeth offered Mary asylum in England for 19 years, which some claim was nothing more than house arrest before her eventual execution.

What is it like to have your own cousin as a deadly rival? The power of absolute monarchy comes at a bitter price, that of being unable to trust anyone around you and having very few peers who can understand how “uneasy is the head that wears a crown.”



Jill Charles grew up in Spokane, Washington and majored in Creative Writing at Seattle University. In 2007 she moved to Chicago where she writes poetry and fiction and lives in the Albany Park neighborhood. Her career includes nonprofit, academic and legal office work. Jill is co-editor of *Batayan*, a bilingual literary magazine in Bengali and English. She performs her poetry at open mic nights at The Heartland Café and Royal Coffee. Jill is one of the Chicago Writing Alliance workshop facilitators at Bezazian Library in Uptown. Read her jazz age novel, *Marlene's Piano*, available from Booklocker.com.



Susim Munshi

Essays from The Education of a Bengali Gentleman — A Sister's Pride

I had a rough time learning academic Bengali in elementary and high school. Perhaps my interests were elsewhere. Like dreaming about becoming an astronaut or traveling across the world as a Peace Corps volunteer. My school subscribed to the “Span” magazine and I fought my friends to be the first to read it cover to cover. Then in July 1969 Apollo 11 landed on the moon and really fired up my imagination. To compound all of my good intent to at least get a passing mark in Bengali, my school required students to speak, read, write English all the time, even in our dreams. My school was a boarding school. I came home only when school was out.

My performance in Bengali deteriorated all year and my frustration increased. By the end of the school year, I feared being held back in my grade. I squirreled away time from math and science, history and geography, and made an extraordinary effort to learn my Bengali spelling.

If the reader is familiar with Bengali they will appreciate when I say I don't remember any rules that clearly showed me when to choose between a “স, শ, ষ” all somewhat acceptable forms of “s”. How was I chose between a “র, ড়” the soft and hard sounds of “r”? During the long written examination I noticed the proctor hovering over my shoulders, shaking his head in dismay. “Susim is not going to have a pleasant winter recess,” I could hear him say. I would go home for winter recess and unlike every kid my age, write Bengali spelling words over and over again. The rest of my friends were playing cricket, visiting the chimpanzees in the zoo, queuing up for a glimpse of Louis Armstrong's moon rock.

I compensated my shakey Bengali spelling by memorising and reciting Bengali poetry and prose. After all I did win the English elocution contest since 4th grade! I would make a compact with my eighth grade Bengali teacher who really wanted our class to win that year's Bengali elocution. I gave up my rightful place at the podium for English elocution and made a dramatic impact on the audience and judges reciting several small selections from Sukumar Roy's “Abal Tabol.” It worked like a charm. I moved on to ninth grade where I could start a new school year studying the sciences, physics, chemistry and biology. The moon seemed within my grasp.

All throughout my childhood and youth Rabindranath Tagore, the Nobel laureate, held a revered place in my life, especially his Rabindra Sangeet. Now that I am retired I have a lot of time to listen, study, understand and appreciate Rabindra Sangeet. And write about it. No more Bengali exams. But I wish to spell correctly. So I turn to my female cousin who lives in Japan. First cousins grow up like brothers and sisters in India.

My sister in Japan, Arati, a homemaker, had been a teacher for a long time. We use technology to text messages in Bengali. My Bengali is getting better in leaps and bounds. She is also a beautiful singer of Rabindra Sangeet. We both have the exact same favorite Rabindra Sangeet. She always sings it masterfully and evokes the right emotions and sentiments. The song is “গোধুলিগগনে মেঘে ঠেকেছিল তারা”, “godhuligogone meghe dhekechhilo tara.” No rules of spelling for



her. Like a great teacher she plods at it every day, sending text messages back and forth several times a day, till I have it right. Recently she taught me how to write the “Bhagavad Gita Pranam Mantra” in Bengali; a prayer you recite after reading from the Bhagavad Gita. First I sent a picture of it written in Sanskrit. Then she sent it back to me written in Bengali.

Japan and the US are at two ends of the world. I like to take Rabindranath with me on my morning walks. Arati, who I address as “Fuldi”, and I video chat and sing and recite the same verses. We observe my garden bloom everyday; I by morning, she by night. Arati says she can smell the roses too. I believe she does it all from “A Sister's Pride!”



"Forward to the *Essays from The Education of a Bengali Gentleman*" by Susim Munshi — The great Stoic teacher Epictetus stated we become philosophers when we examine our preconceived notions, ask questions about our emotions and even the words we use each day. The essays in this collection are an honest self-examination of Bengali sentiments, values, and beliefs as perceived by the author who while growing up in a traditional Bengali household learned to look at them from a different perspective while going to a Catholic School and College in India, then moving to America for the rest of his adult life."



Mekhala Banerjee

Just a Guy

It's a gorgeous summer day in Chicago, all the living creatures are enjoying. Bunny rabbits are hopping around looking for bulbs to dig out. Babies are following their mom. Squirrels are running up and down through the tree branches or electrical wires. Blue robins, red jacks, sparrows have already started their melodious concert without any permission. Humans are not staying behind either. Ria, a Bengali woman in her forties, short thin built wearing jeans and a t-shirt, came out to do some garden work. She enjoys to do it, or more clearly she loves flowers, but she is not accustomed to do any hard work. In India they have "Mali", who works in the garden. She never did any house work, they have people for that. After a while Ria was huffing and puffing, struggling with garden tools, mumbling herself about her husband for not helping. He is addicted to watch games and politics on TV. "Hallo Mam" Ria was scared to hear a deep voice, she looked up, there was a shaggy looking man standing in front of her, skinny tall white man in his thirties. His smiling face is not fearful, but he looked kind of dirty, didn't shave for days. She stood up, "yes". The guy came closer, "I was watching, looks like you are not used to do these kind of work, if you let me". Ria stopped him right there, "no, I don't want your help", she turned away to go into the garage. He followed her, "please, believe me, I can do any kind of work." "I don't need your help" Ria almost shouted, then went inside. She couldn't close the garage door, the haggard looking guy was standing. She stormed into the family room, slammed the door so hard, Nabin was deeply involved in Bears game, lying down on a navy blue sofa, this is his routine, looked at her, "what happened"? "Nothing, there is a guy, maybe a crazy one, tell him to leave" she replied in a bitter mood. Whenever he watches TV and she does yard work, she comes back with a fighting mood, he knows that. He quietly went out to see what's going on, now a days so many things are happening, you will hear as soon as you turn the news on. He came back in after a while, "Ria, from now on you don't have to work hard, I found somebody who will take care of your yard." She was in such a furious mood, she didn't care or maybe didn't listen.

Next morning the door bell rang, Ria was shocked to see the yesterday's guy at the door step. "why you are here again?" she yelled at him. He replied with the same smile as before

"he told me to come today to work in the yard"

She went upstairs to wake Nabin up to take care of the guy. That was the beginning, then so many years passed by, nobody knew how that haggard looking guy became a trust worthy helping hand. He started coming almost every day, asking Ria during lunchtime, "can you make some hotdog for me?" She was making it anyway for her son. After a while it became a routine. She didn't want him to sit with them on dinner table, but when her son told him to come inside and eat with them, Ria couldn't say "no", although she didn't like that. His clothes weren't clean, hair was shaggy. Once he was working on the attic, he was taking longer time than Nabin thought. They had to go out, he was getting annoyed, "he is so slow, you like to give him every job you can find, ridiculous". She came on his rescue, "you gave him the job when Sears gave a higher quote than him". "ok, ok, ask him, how long it would take". "We can leave, he will close the door when he will be done", she said it in a straight face. "Are you kidding or what? You will leave the whole



house open to him?" his voice was raised. "Why not ? He is not a thief, he doesn't care for things. I can trust him totally". She wasn't talking softly either. Ria went upstairs, "hey how long it will take ? We have to go out". "May be couple of hours, I will close the door, by the way, could you leave some food on the table". Ria changed, told Nabin to get dressed, made a big chicken sandwich, left it with some chips and a coke.

They got into the car, Nabin started the radio.

She was listening her cd, they were not in a mood to talk. At the party, Ria over heard Nabin was telling "you couldn't believe, one day I am telling you guys we will be robbed."

Ria went to the kitchen to help the host, she didn't want to hear the same story again and again. "Oh! what a paranoid, I am glad that my kids didn't inherit his genes", she thought. After dinner all were sitting in the big living room, "Ria, please you can't be so kind, now a days as soon as you open up the TV you hear some scary story," Minadi said in a very authoritative tone. She is several years older than them. Now Suva the host, joined them, "I was listening piece by piece, what's the story". Minadi told the execrated version. "Oh my God! Ria, are you out of your mind ? I really can't believe, a smart lady like you could take such an idiotic decision like this". Ria was totally lost at the same time furious at Nabin, for making a big storm out of a tiny little breeze. She didn't say a word, but her face could explain, everybody else was out of their mind not she. After the party on the way home they didn't talk either.

Today they were the first person to leave, usually that's not the case. Everybody were so worried, "something might have happened already, they should have gone earlier and check, may be they have to call police right away", Suva's husband Ron announced while

they were getting into the car. As soon as she put her seat belt on, "thanks a lot for putting up a nice drama". He kept quite , may be he felt a little guilty to let the situation go out of control.

He knew the crowd, he should have known it better. Another day, he was so upset, almost slapped Sunny. Even though Ria didn't like Sunny to wash his muddy clothes and shoes in their washing machine, but she was more tolerant than him. Sunny's reason was, he didn't have money to use laundromat, his son was right she knew that. Little by little the guy acquired a small spot in their mind. He used to get vanished from time to time. Mostly Ria started to think "what happened to him ? Did he get sick ?" Ria's disgust attitude towards him started to change slowly. Time goes by in it's own schedule. If the guy wouldn't show up at her doorstep after the winter, she gets worried about the well being of that shaggy looking guy. She didn't notice when that annoyed smile put a dent on her mind. She even told her son, "why don't you ride your bike through the neighbor hood. You might see him sitting some where". Nabin watching TV, heard her saying that, smiled himself "that's Ria". Ria's son Sunny a teenager, friendly, fun loving kid, having hotdog with him sitting on the backyard, talks to him. That became a routine for every summer. Mom and son loaded him with jacket, sweaters, blankets. One summer he was late more than a month, Ria opened the door, here he was with the same smile on his face. "I thought you were dead", Ria joked. "you are older than me, so you will die before me. I will dig up your grave", he answered. She came to the kitchen to make hotdog. Sunny wanted to invite him for his graduation party. When Ria was going towards him, Sunny noticed, ran to her, "Mom, don't tell him to take the garbage away, today he is our guest too like everybody else". Ria felt so ashamed of herself, actually she did want to approach him for garbage, on the other hand she felt proud of her son. Before anybody



knew that guy made a spot for himself on their household. Now Ria knew all about him, mostly from her son, he is the one who talks to him. His father thrown him out of his house when he was only twelve. That broke Ria's heart, in India even the poorest family wouldn't through their kid out of their house, they may eat one meal but still they would stay together. He grew up on his own on the street, slept in woods, even in harsh winter. He gathered things from garbage, or by virtue of some good Samaritan's donation. After long two decades he found contact of his mom, but it was too late, she didn't live long enough to stay with him. One winter night they went to bed, after watching the news, Ria got cozy to Nabin, "do you mind if I tell him to stay in our basement?" Nabin got a shock, moved away sat up on bed, "what? No way, I wouldn't allow any stranger inside our house, you are the one who got mad at me when I hired him to help you in the garden, remember? Now you want him to stay inside the house? How much you know about him?". "he is a nice guy." Ria protested. "listen first, don't argue, your son knew all about him. Actually he took Sunny to the woods to show him where he lives." "what? Do you know how many rapes and murder happened in the woods? How did you allow him to go without asking me? Oh, no you are really something." At the end his voice showed frustration. "from tomorrow he wouldn't have to come here anymore" Nabin declared. Ria got of the bed to get some water. "This is winter he doesn't come now, this winter is going to be very tough, that's why we are planning him to stay here." He interrupted her, "who are we?" his voice was loud, he sounded really upset. She came back holding a glass of water on one hand, held the foot rail to get a support. She was wearing a purple color nighty, her hair tied in a pony tail. "calm down, try to understand." He shut her off, "I am tired let me go to sleep now, will discuss it tomorrow". He slipped under the blanket turned around away from Ria. She didn't have a choice not to try to go to sleep. Within few minutes he started snoring, she was wide awake, that day Sunny was so excited to describe how in the woods he put up a tent, although everything was dirty, her son is an adventurous kid, she loves his nature. Her eyes were visualizing her parent's house. She grew up in a completely deferent kind of household. It was a small town, they lived in a big house with so many people not only the family members. Dad's and uncle's friend coming in town for varieties of reasons, court case, doctor's visit, board exam etc.. During Puja (religious festival) people from servant's family used to come from village. It was so much fun playing and talking to them. She didn't remember no one was ever worried about these kind of thoughts.

She turned around towards Nabin, he was sleeping like a baby. She touched him, felt about him, "he grew up in a city like Calcutta, there was always something going on, maybe they were not allowed to trust any stranger." she gave the benefit of doubt of his behavior.

Sun rays invaded her bed through the big eastside window, Ria opened her eyes, stretched to feel if he is there or not. He had gotten up already, she could get the smell of coffee, that was the only job he happily accepted. After the usual morning chore she came to the kitchen, poured fresh coffee to a cup, sat down on the sofa by Nabin. TV was on, she took a ship of coffee, put a hand on his lap, "I was sorry for last night, you know," He interrupted her, "I am sorry too, I knew your intention was very good, but in this country there is no door you can lock, that is extremely dangerous. Anyway we didn't know anything about his past. I can call couple of churches to find out if they allow any homeless like him" his eyes were on the news though. Ria was relieved, released a heavy sigh. She straighten herself to sit properly, "you may not know, but we knew him for several years. Sunny always talked to him. He never took a can of coke even without asking me, do you know I was so amazed to see such a strong character, he asked me to take off for an hour,



when I asked “why don't you finish then leave” “he told me the social security office will be closed he had to call right now.” I really couldn't believe the answer he gave, “I had no cell phone, I have to go to a pay phone.” “Have you ever imagine a poor, I mean really poor homeless guy didn't even ask me to use our phone. I have a great respect for him, he may not be educated, wears dirty clothes unshaved shaggy look, but as a person he is way above average. I did understand your point of view, you are absolutely right, you never know”.

“Hi Mommy” Sunny came down, “what's for breakfast ?” door bell rang, he ran to open the door. “Hi Glen, come inside, it's getting chilly,

Mom is making egg mac muffin”. Ria got up to the stove, she heard her sun was trying to convince him to stay in our basement. Ria got scared eagerly waiting for the answer, Nabin said he will find some place for him. Her eyes was flooded with tears when she heard him saying “I love to stay in woods, I belong there, I have been on pavement, under the bridge or woods since I was twelve, don't worry man, I sleep well under the sky shining with thousand stars.” “But there are animals” Sunny was concerned. “They know me, they won't hurt”, he smiled. Ria put her sari to hold her tears, she didn't know the difference, relived or happy.

“You are not just a guy” she uttered.





Sreya Sarkar

Demonizing Intellectualism in India is Like Punishing the Youth for Being Curious

Has one wondered why there has been such a mass exodus of students from India to other countries? Indian parents who lament that their children are immigrating abroad need to understand the prime reasons behind this tough decision. Those who seriously intend to pursue academics, especially in the social science and humanities fields don't find too many options in India today. The few good universities remaining are also facing budget cuts and are being forced to align philosophically with the present political leadership in the country, to merely survive.

Higher education in India has seen better days and I was fortunate to witness that myself. I had learnt the ABCs of Political Science in my undergraduate college, studied the technical definitions of a range of political processes and regimes there but what they actually looked like when applied in a society is something I discovered in my Masters at Jawaharlal Nehru University (JNU). For the first time, I was exposed to rigorous methodical investigation of social revolutions and political upheavals in the core courses. And also for the first time, I could ask questions that came to my mind without feeling awkward or self-conscious because I was in an environment where students were not judged because they were curious. My subject became a living, breathing entity, a real-life experience, a novelty in itself, and not just some stuffy textbook material I needed to memorize and print in examinations to acquire my higher education degree.

I remember how the professors at JNU did not generally give us class-room restricted examinations at the end of the semester. Instead we were encouraged to pick topics related to the courses and carry out in-depth secondary research. No one pressured us to finish assignments or attend classes. We simply did all that because we were genuinely motivated to hone our critical thinking. It was challenging at times but also invigorating and made us feel truly grown up, like our thought process and analysis really mattered in the real World.

There were other kind of challenges that irked some of our pampered selves though, like learning to survive in a hostel for the first time, enduring the hot, dry weather of Delhi and being served bitter gourd and lentil that smelled like burnt plastic for dinner, but all that had nothing to do with academics. Some of us would fall ill often, but that was all a part of growing our immunity to survive in the real World outside. Overall, the two years at Jawaharlal Nehru University taught me two important life lessons. First, to think critically and boldly. Second, to be open minded.

Last year, when I went back to JNU after sixteen years, I found myself in the same old dusty campus I had left behind. Much remains the same. The overgrown bushy vegetation crowding the walking trails, colorful posters adorning the walls of the School of Social Science buildings, a relaxed group of students playing gully cricket after class, folks stopping for cups of tea at the rickety food shacks, the usual rush to the libraries to collect or return books, the longish line in front of the Xerox machine, a few lone figures scattered on the steps of the Social Science Department staring at nothing in particular, lost in a World of their own. There has never been anything flashy about the campus or the students in it. Simplicity has been the only ongoing style since its' inception. Visibly the two things that seemed substantially different was the lack of serpentine lines of students in front of the phone booths, as most students own a mobile phone



now and the fresh sprinkling of red brick buildings, added here and there to accommodate the increased number of students in the campus.

As I strolled through the familiar landscape, my mind was extra alert, taking in the details and making note of the energy level in the campus, but nothing extraordinary caught my eyes. I had read so many articles and seen such disturbing videos of the JNU “sedition” row in the last two years that I had foolishly expected some kind of filmy riot to break out at any moment, but that did not happen. The campus remained calm and studious as always.

My initial reaction after reading the media articles about the 2016 row had been like many others. *Why did the students have to kick up a useless fuss over Afzal Guru when there were so many other real issues in India?* I had wondered. But since then I have had the time to ponder upon the significance of the episode. Perhaps the messaging was wrong, the slogans were somewhat unwise yet none of it was ill-intentioned, I realized over time. Instead of nit picking on the semantics around the event, it could be far more constructive to scrape the surface and try to decipher what they were really trying to examine in the event that gave rise to so much unwanted excitement and presented the entire nation the excuse to ridicule a well-functioning university and reduce it to a petty cliché with “Desh drohi (anti-national)” and other colorful allegations pouring out of the mouths of an ignorant mass of people.

It all started with a cultural event in February, 2016. It was an art and photo exhibition primarily discussing the “struggle of Kashmiri people for their democratic right to self- determination.” It was organized by Kashmiri Indian students, and was supposed to be an important bridge between the two major types of status given to Afzal Guru--- a terrorist or a martyr? It was a thorny topic I agree, full of inflammable sentiments and bitter personal experiences, but the organizers had not predicted that it would snowball into such a major controversy.

What followed was pure political drama, aided by some irresponsible Indian news channels. Soon after JNU Students Union President Kanhaiya Kumar was arrested, slammed with Sections 124A (Sedition)¹ and 120B (criminal conspiracy) of the Indian Penal Code. Investigations into the incident were carried out by the Delhi government and the University administration. Neither could find enough evidence against Kumar and declared that the controversial slogans came from outsider participants and not the students in JNU.

It was a lot of sound-bites, a half year of free picnic for journalists and aspiring politicians who milked the event and the university to the extreme. For those who are not aware of the politics around it, this event could seem to have arrived oddly out of the blue but, in a way it signaled the beginning of an end. The sedition row controversy brought JNU to the national limelight, but the process of disrupting the university from within had already begun two years ago in 2014.

Romila Thapar, eminent historian and one of the founding members of JNU stated in a Frontline magazine [interview](#)² earlier this year that the founding Vice-Chancellor of JNU, G.

¹Sedition Law is a colonial law dating back to 1837, used to suppress Indians when they were protesting against the British rule before Indian Independence. Today it is loosely used to arrest anyone who makes any critical comment against the government. Previously, social activists like Binayak Sen, Arundhati Roy and cartoonist Aseem Trivedi have also been slammed by this law.

²“JNU's questioning minds a problem for indoctrinators”-Interview of Romila Thapar by Ziya Us Salam for Frontline magazine, April 27, 2018



Parthasarathi was clear about the function of the university. Its' purpose was to impart broad-based knowledge, and even more importantly, to teach students to think independently. Furthermore, the founding VC had taken a stance that the university must be accessible to all those that aspire to be its students and are qualified to be so. These guiding principles in the founding of JNU were followed in subsequent years and gave it a somewhat different orientation from that of most other universities in the country.

The system worked mostly as I have personally experienced. There were no compulsory attendance rules, yet the classes happened on time and were well attended. The exams were held regularly, the grading system was transparent and fair, the relationship between the professors and the students was based on mutual respect and the willingness to collaborate rather than maintain a formal teacher student dichotomy.

It was not perfect always. There was bad infrastructure for the students to endure---lack of water and at times no electricity in the hostels, but the students learnt to shrug it off by saying, *at such a subsidized rate, no accommodation will be perfect.*

There were some sexual harassment cases, but GSCASH, the University's Gender Sensitization Committee against Sexual Harassment acted as a tough watch dog and a strong deterrent for all those elements who thought they could get away with disrespectful behavior. The lesser known fact is that GSCASH was equally supportive of men who made complaints against women. Its' agenda was to prevent and punish sexual harassment. It was neither feminist, nor radical in essence. Students on campus felt safe enough to venture out whenever they wanted, wearing whatever they chose. They could socialize with others without being attacked verbally or physically. Delhi did not feel safe, it still does not feel so, but JNU did.

The academic bodies in JNU like the Academic Council and the Executive Council were previously coherent. The decision-making process regarding the curriculum, the admission criteria etc., was democratic with open participation from students and professors alike.

The composition and the activities of these academic bodies have transformed in the last four years. Ever since Professor M. Jagadesh Kumar, the current Vice-Chancellor has come to office lots of such changes have come about. The JNU Executive Committee last year dissolved GSCASH and in its place appointed the Internal Complaints Committee. More recently, the Academic Council passed the resolution to start a new department called Center for National Security Studies to teach courses like "Islamic Terrorism". The student union representatives were not allowed to participate in this council meeting and the teacher's union office bearer who protested against the title "Islamic Terrorism" and suggested that at least they should rename it "Religious Terrorism" was told by the chair that his "objection" would be considered "later".

There was an attempt earlier this year to make attendance compulsory not only for the Masters students but also for the MPhil and Doctoral candidates registered at JNU. That met with a strong resistance from students and professors who found the rule absurd as the university never really had any attendance problem.

The university has been constantly bombarded with change in rules without any academic logic and now with Kumar's arrest and the following harassment of the student's union, it is clear that JNU is being attacked in every way possible, given the slightest excuse.

The agenda is clear.



An institute that helps free thinking, makes students bold enough to criticize the government actions, is a threat to the authoritarian regime the country is heading towards. And if you are thinking that it is just Delhi, the center with a particular party in power that is stamping on the right to freedom of expression, think twice. If you rake history you will be surprised to find that such atrocities have taken place in regional states too, that too in those states that have had a very different political orientation than the present party in power at the center.

Anti-nationals, Terrorists, Naxalites, Maoists---these are just few of the common terms used arbitrarily for intellectuals who have spoken up against the government excesses and unfairness from time to time. And the root of all intellectualism, seem to be the universities, especially those that have strong social science departments. So, what does one do to stop them? Reduce them part by part in a hushed clandestine manner and then finally destroy them altogether.

The thought that might pop into your minds at this point may be on the lines of "I understand why you feel a certain amount of attachment to your alma mater and would indulge in a passionate rant like this, but I did not study there, no one in my family did, so why should I care?"

One should care. If one is interested in nation building and the safeguarding of democracy, one should care. If one is interested in keeping their children from migrating in large flocks away from India, one should care. And here are the reasons why.

First, universities with strong social science programs are an asset. What many don't realize is that they prepare the next generation of social work practitioners, policy makers and researchers with competencies to address our society's multiple needs. Before the media and the ill-informed Indian public attacked the JNU students and researchers, calling them leeches living off public money while soldiers died defending our borders, they should have done their homework well (perhaps they did not do so because it was not "compulsory" just like the attendance in JNU). That could have informed them that JNU alumni are everywhere. They have been representing India nationally and internationally as civil servants, diplomats and renowned journalists. They have been participating energetically in social activism³ and in the electoral process. Many have become elected officials and several have been the driving brain behind important national projects. A fun fact is that even the man behind the present central government's "Make in India" campaign is a JNUite.

Second, central universities like JNU are special as they enhance diversity and teaches tolerance which is the exact opposite of what the popular brand of nationalism in India is propagating now. JNU welcomes all students, whether they are from metropolitan cities or small villages and that is much needed in a nation that has so many cultures and religions coexisting. It teaches young citizens empathy and compassion which is the only way to proceed in a multicultural nation like India. To proliferate a narrow definition of nationalism in a complicated mix of cultures and to close down universities that try to understand such a complex mesh of ideologies will only worsen the regional uprisings that have raised their heads repeatedly and result in an ugly civil war in the country.

Third, in today's world where a barrage of information hits us in waves regularly through conventional media, social media and WhatsApp, it becomes difficult to separate authentic

³ "15 Noted JNU Alumni Who Have Proudly Represented India Nationally and Internationally" by Sampada Sharma, scoopwhoop.com, Feb 26, 2016



information from misinformation. Social science teaches one to see through conspiracy theories, rumors and political propaganda by asking the right questions and builds the ability to analyze the answer objectively.

Fourth, it is not just JNU that has been facing the heat, other universities like Delhi's Ambedkar University, Hyderabad University, the Tata Institute of Social Science are all facing tremendous budget cuts. Political appointments at the level of Vice Chancellors have already started in many of these universities. Soon there will be no value of a teacher's merit and competencies and that can only mean sub-standard higher education for an entire nation's youth.

Fifth, another disturbing proposal is the revival of the Central Universities Act of 2009 which asks the central universities to follow a common admission procedure, common syllabus and transferable faculty which does not fit the needs of the large, heterogeneous population it is supposed to serve. "This proposal will minimize autonomy, narrow the space for innovation and create a teaching culture where creativity and critical thinking will be curbed," said [Zoya Hasan](#)⁴. She is one of my favorite professors from JNU and is currently the ICSSR National Fellow at Council for Social Development in New Delhi. Gradually but surely, the country's entire education system is changing as the textbooks get re-written and the syllabus is filled with mythology and religious texts. The central government has already quietly appointed a committee of scholars a year ago. The intention of this committee according to [Reuters](#)⁵ is, "To use evidence such as archaeological finds and DNA to prove that today's Hindus are directly descended from the land's first inhabitants many thousands of years ago, and make the case that ancient Hindu scriptures are fact not myth." This sounds as scary as the Nazi use of the "perfect Aryan child" propaganda to control Germany that ultimately led to the nation's terrible downfall. The universities are the last bastion upholding freedom of thought and speech. Once they come down, the rest of the slide will follow soon and it will affect all of us calling India our motherland, whether we live there or outside.

While so many Indians are striding forward, contributing significantly to World politics, science and economy, back in India the education system that bolstered this generation of successful Indians, honed their skills and set them intellectually free, is being shackled in regressive chains. Ultimately, nationalists of all stripes in the nation must realize that India's borders need to be defended not just against the enemies outside but also against alienation within the borders. To call the idealist youth engaged in building crucial cultural bridges as anti-national is not only legally absurd but also politically dangerous for a nation in constant ideological flux. Parents and concerned Indian citizens should note that the future of our country is the youth. By alienating and banning the youth for their ability and will to think independently just to serve the cheap needs of a political party is an act of "sedition" in the process of nation building, by itself.

⁴"No ache din for higher education" by Zoya Hasan, The Hindu, April 2, 2016

⁵"By rewriting of history, Hindu nationalists aim to assert their dominance over India" by Rupam Jain and Tom Lasseter, Reuters Investigates, March 6, 2018



Souvik Dutta

Shuka and Janaka

यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च /

यत्रैवोपषमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः //

yataḥ sarvāṇi bhūtāni pratibhānti sthitāni ca /

yatraivōpaśamaṁ yānti tasmai satyātmanē namaḥ //

~ *Yōgavāsīṣṭhaḥ, Verse 1*

Translation – I bow in reverence to the Ultimate source of existence in this universe. The nature of this source is pure and unadulterated Truth. It is from this Truth that all beings radiate into existence. It is this truth which sustains all beings. It is this truth alone where all beings eventually dissolve into.

There is wisdom in truth, knowledge in truth but how important is the source of this knowledge? Who has the qualification of being a Guru? Do we associate Guru with his/her attire, designation or stature in society?

Ancient seers always left behind for generations deeply encoded philosophical lessons in beautiful simple stories. We find such a beautiful story in a classical text of Sanatan Dharma – Yogavasistha. Yogavasistha is an amazing book on Vedanta. The author of this classic text never thought it was important to mention his/her name. This has been the highest philosophy of Sanatan Dharma. What the Guru had to offer was more important than who the Guru was. Some scholars say the text was written as part of Ramayana by Valmiki and later taken out of it to become an independent text for students. The text has also been summarized and verses reduced to form a shorter version of the text called Laghu Yogavasistha. The text is dedicated to Rsi Vasistha and is in a form of a dialogue between the Rsi and his student, none other than Sri Ramchandra.

In the classic, there is a story about Shuka and the king Janaka. This is one of my favorite stories which I often mention in my seminars when we discuss the importance of perception. Another version of the same story is very popular among Sikhs and found in the text Aadh Guru Granth Bhagat Mala. I will combine minor variations of both the stories and present it here for you.

After one hundred years of austerity, Vyasa churned Shuka out of a stick of fire. This is the story of the birth of Shuka as per the great epic Mahabharata. Since Shuka was born with great ascetic power, he was never interested in the life of a householder. Now, the Vedic mode of life had four ashrams – Brahmacharya (student), Grihastha (householder), Vanaprastha (retired) and Sannyasa (renunciate).

During Brahmacharya ashram, Shuka, on advice from his illustrious father, went to study with Brihaspati, the Guru of the Devas. Brihaspati taught Shuka all the knowledge he had. Shuka having



received this knowledge glowed like the gods themselves. He returned to his father Vyasa after studying with Brihaspati for many years.

Vyasa then instructed Shuka to enter into Grihastha ashram. Shuka respectfully declined and said that he had no intention of entering into material life. His illustrious father sensed that this arrogance in his Shuka stemmed from the pristine wisdom he gained from Brihaspati. Wisdom should only result in humility. If wisdom in a person causes ego and arrogance, such an individual is surely on a path of failure. Vyasa being the father of Shuka loved him dearly wanted to correct Shuka before it was too late.

Vyasa instructed Shuka to go to his next Guru to gain the knowledge of Grihastha ashram. Shuka was always eager to learn and so was very excited to learn the name of his second Guru, especially after having such a great teacher as Brihaspati as his first Guru.

Vyasa spoke "Dearest son Shuka, I would like you to go to the kingdom of Mithila and request the king of the kingdom, the great king Janaka to be your Guru. Consider this as your father's order."

Shuka was extremely surprised and exclaimed – "Illustrious father, your word is my command but do you think a king immersed in deep material pleasures will be able to teach me anything worthwhile in life?"

Vyasa smiled and left. Shuka started his journey to the kingdom of Mithila.

When Shuka reached the gates of the Mithila, the guards stopped him and asked him his identification. Shuka, with great confidence and expectation of respect, said he was the son of the illustrious Vyasa and requested an audience of King Janaka. When Janaka heard that Shuka had come to visit him and what he had mentioned to the guards, he asked the guards to take him to the normal guest quarters and made him stay there waiting for His audience for 3 days and 3 nights. Shuka was shocked by this behavior but he couldn't leave without meeting King Janaka as was instructed by his father. So he patiently waited. On the 4th day, Shuka was escorted into the prime guest house with beautiful maidens and was offered kingly garments and ornaments and delicious meals. This shocked him too as he thought any wise man would know that a student seeking wisdom is hardly interested in worldly pleasures.

On the 5th day, Shuka was escorted to King Janaka's palace. Janaka was sitting on a royal golden throne wearing kingly garments, expensive jewelry, attended by women all around him. The scene confirmed the assumption Shuka had been developing all these days, King Janaka is immersed in deep materialism and materialistic pleasures of the world. Shuka thought to himself – "There is nothing wrong with a king to be materialistic. However, I still don't understand why my wise father sent me to this materialistic king to learn and accept him as my Guru."

On seeing Shuka, Janaka like any other king went up to him, greeted him and offered his seat. Then Janaka asked Shuka – "Dear Shuka, please accept my pranam. Do let me know how I can help you and what is the purpose of your visit?"

Shuka said, "King Janaka, please accept my pranam. I was born from the fire of austerity of my illustrious father, Vyasa. I have studied the shastras under the Guru of the gods himself. After the completion of my Brahmacharya ashram, I returned home and my father wanted me to enter the Grihastha ashram. When I mentioned that I had no interest in Grihastha ashram, my father insisted that I visit you and accept you as my Guru to learn more about Grihastha ashram."



Janaka smiled and asked – “Dearest Shuka, do you think there is anything to learn in Grihastha ashram?”

Shuka confidently replied – “King Janaka, I honestly feel it is a waste of time to even learn about to this ashram. I don’t believe Grihastha ashram can teach me anything of value to me. I don’t understand the necessity of this ashram at all.”

Janaka smiled and asked Shuka to take a tour of the kingdom and visit him the next morning. Shuka took a tour of the beautiful city of Mithila. Like any other kingdom, people were busy trading, buying, selling, fighting, loving, caring, abusing. All possible mundane events were taking place. Shuka tried to see if there was any spiritual wisdom in them but he could find none.

On the 6th day morning, Shuka arrived to see Janaka. Janaka spoke to Shuka – “Dearest Shuka, I have arranged for a beautiful festival in the city. Many people would like to seek your blessings since they came to know you are the son of Vyasa. Some important scholars would like to debate and discuss the shashtras with you as well. You will have a busy day ahead of you. Please take this cup filled to the brim with oil. During your day, please ensure not a single drop of oil spills from this cup. If a single drop of oil spills from this bowl, my guards will behead you right there at that spot. Enjoy your day!”

Saying this, Janaka left the scene. Shuka was shaking holding the cup of oil in his hands. Two guards immediately stood by his side and escorted him to his chariot. Shuka, however, was focused completely on his bowl of oil. The chariot passed through the city where there was a beautiful dance presentation for Shuka but Shuka didn’t even raise his eyes from the bowl to see it. The chariot stopped at a school where scholars were waiting to discuss the knowledge of the scriptures with Shuka but Shuka didn’t get down from the chariot. Finally, the chariot stopped near Janaka’s palace and Shuka very carefully got down from the chariot, entered the palace and got in front of King Janaka.

Janaka was surprised to see Shuka back so early. He asked – “Dearest Shuka how did you enjoy the city, the dances, the scholarly discussions and the debates?”

Shuka, still focused at the bowl slowly moved to the king and handed the bowl over. Shuka said – “King Janaka, I have no idea what kind of a joke this was? How could I have seen anything in the city when you had mentioned to me that not a single drop of oil from the bowl should fall out? The whole time my complete concentration was on the bowl of oil. Please note that not a single drop of oil spilled from the bowl.”

Janaka smiled and asked Shuka to see him at sunset the next day.

On the 7th day, Shuka went to meet Janaka at sunset and was surprised to see the scene. Janaka was clad only in a white dhoti, no gold, no ornaments. Janaka was alone in a small room with a stone Shiva Linga. The room was also very humble, like a cottage of a Rsi. There were some texts in one corner, a rumble seat, and a lamp. Shuka was very puzzled indeed. There was a radiance glowing from the face of Janaka.

Janaka smiled seeing Shuka and asked him to sit with him.

He spoke – “First three days I tested your patience Shuka. 4th day, I exposed you to materialism and wanted to see how you react to it. You passed my test on all the 4 days. You could have easily left but your father’s words were more important to you than my insult. Materialistic



abundance didn't impact you either. 5th day, I tested you with perception. Your real test started that day. Perception is the key thing to learn about in the Grihastha ashram. You saw my material abundance and measured who I would be. The 6th day was your test. That cup I gave you is manas (mind), the oil in the cup is Atma (spirit) completely focused on Paramatma (God). Only a perfectly still mind can hold an Atma which is focused on Paramatma. This is why the cup has to be still, a single ripple in the mind will disturb the focus of the Atma. The challenge of the Grihastha ashram is that although the mind has to be still, the Atma has to be focused on the Paramatma, the body has to be in a constant state of mobility and engage with other people to help them evolve. This was the chariot and all the festivities of the city. As a king, I have to fulfill the dharma of my position, I have to be physically present in my kingdom, run and rule my state, take decisions for others, provide justice, look after the welfare of the citizens but in doing so I have to maintain the perfect balance of the mind. People will perceive me in many different ways – some will call me cruel, some materialistic, some pleasure seeking, some arrogant, some helpful but those images are not me. What I have is not a measure of who I am. This is the most important lesson of Grihastha ashram, my dear Shuka. Only in the evening, at sunset, after completing my duties as a king and before embarking upon my duties as a husband and father, do I get one ghatika (48 minutes) time for myself. During this time, I worship my aradhya Shiva, read my texts and teach anyone who is interested to learn anything from me. This is my life as a king."

Shuka was in tears. He fell to the feet of Janaka and said – "Respected King Janaka, please accept me as your most humble student. You are not only a Raja, but you are also a Rsi. From today, the world will know you as Rajarshi."

It is said that Shuka learned about Grihastha ashram from Janaka for many years. He learned to respect incomplete common people and learned to see the best in people so that he could help them evolve. Some say, Shuka even went to have a family of his own. Some say he always remained a Brahmachari. Nevertheless, the encounter with Janaka changed the talented, arrogant, skillful Shuka to a humble, humane, wise Shuka.







Kolkata Book Fair – 2019

